লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমি

লালগোলা ✦ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ ১৯১৪

পত্রিকা

১লা ভাদ্র, ১৪৩৩ (১৯ অগস্ট, ২০২৬)

লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমি

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ ১৯১৪

লালগোলা এম.এন. একাডেমি-এর পক্ষ থেকে

অরুণ কুমার দাস (প্রধান শিক্ষক) কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান সম্পাদক

সম্বল কুমার ঘোষ

সম্পাদকমন্ডলী

বিনোদ কুমার ভকত, জিনাত মহল, সাফিকুর রহমান,
মোঃ জিয়াউর রহমান, সম্পা দত্ত, মহম্মদ আলামিন,
অম্লান ঘোষ, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রামাণিক, অনুপ কুমার পাল,
অরিন্দম ভাদুড়ি, শিবানী হালদার

স্কুল পত্রিকা - ২০২৬

প্রকাশ কাল ঃ

১৯ আগস্ট, ২০২৬ (১লা ভাদ্র, ১৪৩৩)

প্রচ্ছদ চিত্র

অনিকেত পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যালয়ের অভিভাবক-অভিভাবিকা, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হতো না।

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

প্রিন্ট-এক্স

২০/৬, সি.আর.দাস রোড

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

যোগাযোগ ঃ ৮৬১৭৪৯৮০৭৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিগত দিনে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বদের
আমরা হারিয়েছি,
বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রইল তাঁদের
প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

মদনমোহন রায়, শান্তিগোপাল দাস, মহিমা রঞ্জন দাস,
অলক কুমার সান্যাল, রণেন্দ্রনাথ দাস, পাঁচকড়ি দাস,
শিবেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বিকাশানন্দ রায়, নিলয়ানন্দ রায়,
রমেশ চন্দ্র রায়, মহঃ হোসাইন, অনাথবন্ধু দাস, শ্যামাপদ পাণ্ডে,
গোপাল চন্দ্র ঘোষ, মনোজ কুমার দাস, আনন্দমোহন বিশ্বাস,
মানস কুমার রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, নকুলেশ্বর গাঙ্গুলী,
সুকুমার সেন, দিবাকর ঘোষ, শম্ভুচরণ মজুমদার,
চন্দ্রনাথ সাউ, নিতাই চন্দ্র দাস, গৌরী বাঠিয়া, রঞ্জিত চৌধুরী,
বিষ্টুচরণ দাস, মহঃ হাবিবুল্লা, ভোলানাথ দাস, অরিন্দম চক্রবর্ত্তী,
তপন কুমার দত্ত, এছাড়াও আরো অনেকে।

Staff - 2026

HEADMASTER

1. ARUN KUMAR DAS .... M.SC. (BOT), M.A. (EDU), B.ED

ASSISTANT HEADMASTER

2. BINOD KUMAR BHAKAT .... M.SC (BOT), B.ED.

ASSISTANT TEACHER

3. TAPAS KUMAR ROY .... B.A., B.P.ED
4. TARUN KUMAR MANDAL .... B.A. (BENGALI HONOURS), B.P.ED
5. SAMBAL KUMAR GHOSH .... M.A (BENG), B.ED
6. PURABI ROY .... M.A. (PHIL), B.ED
7. KRISHNA PRASAD PRAMANIK .... M.A. (PHIL), B.ED
8. MANORANJAN DAS .... M.A. (GEO), B.ED
9. CHINMOY DAS .... B.Sc. (Pure), P.G.B.T.
10. SHAFIKUR RAHAMAN .... M.A. (BENG), B.ED
11. AMLAN GHOSH .... M.SC. (Zoo), B.ED.
12. SAMPA DATTA .... M.A. (SANS), B.ED
13. MD SERAJUL ISLAM .... M.SC. (PHY), B.ED
14. MD. KAMAL SK .... B.SC (PHYSICS HONS), B.ED
15. MD ALAMIN .... M.A. (ENG), B.ED
16. TARIQ MD ABU HURAIRA .... M.A. (HIST), B.ED
17. TRIDIP SARKAR, ... M.A. (GEO), B.ED
18. ABHIJIT SANYAL .... M.SC. (PHY), B.ED
19. SUMAN DAS .... M.A. (BENG), B.ED
20. JAGADISH SAHA .... M.SC. (CHEM), B.ED
21. MD MUSTAK AHMED .... M.A. (GEO), B.ED
22. MD ZIAUR RAHAMAN .... M.A. (MATH), M.A. (ENG), B.ED
23. MD AZAHARUDDIN .... M.A. (ENG), B.ED
24. MD JAHANGIR MIAN .... M.SC. (PHY), B.ED
25. SAFIUL HOSSAIN .... B.SC. (PURE), B.ED
26. IMTIAZ AHMED .... M.A. (POL), B.ED
27. NAZMUL ALAM CHOUDHURY .... M.C.A., B.ED
28. SUDIP SARKAR .... M.SC. (MATH), B.ED
29. SUBHANKAR SAHA .... M.SC. (MATH), B.ED
30. SHYAMAL KUMAR MAHATO .... M.A., (HIST), B.ED
31. LALMOHAN BISWAS .... M.A. (GEO), B.ED
32. MAMOTAJ KHATUN .... M.A. (BENG), B.ED
33. JAHANGIR HOSSAIN .... M.A. (GEO), B.ED
34. MOUDUD AHMED .... M.SC (MATH), B.ED
35. MD BAGBUL ISLAM .... M.A. (ENG), B.ED
36. RAJ KUMAR BHAKAT .... M.SC (BOT), B.ED

37. JENAT MAHAL .... B.A. (ENG HONOURS), B.ED
38. MOUMITA DAS .... M.A. (HIST), B.ED
39. MD ABDUR RASHID .... B.A. (Arabic), B.ED, M.A (Hist), M.M. (Arabic)
40. ANUP KUMAR PAL .... M.A. (ENG), B.ED
41. MOZAMMEL HOQUE .... M.A. (ENVS), B.PED

PARA TEACHER

1. RAKESH DAS .... B.SC. (MATH. HONOURS), D.EL.ED
2. MANALI SINHA .... M.A. (HIST), D.EL.ED.
3. JHUMA DHAR .... M.A. (BENG), B.ED
4. LEENA TASNEEM .... M.A. (ENG), D.ELED

LIBRARIAN

1. ARINDAM BHADURI .... M.A., B.SC., B.LISC

VOCATIONAL STAFF

NSQF – এ নিযুক্ত শিক্ষক,

AUTOMOTIVE

1. SUBRATA HALDAR .... B.Tech

IT & ITES

2. BISWAJIT MONDAL .... B.C.A, (Computer)

NON-TEACHING STAFF

1. MOUSUMI SARKAR, CLERK .... B.A.
2. A. N. ASFAK ALI, GR.-D .... VIII PASS
3. SHIBANI HALDER, GR.-D .... B.A.

VOCATIONAL

3. BRIJESH DAS .... B.C.A.
4. BILKISH KHATUN .... ITI
5. CHANDRASHEKHAR MUKHERJEE .... B.COM
6. BRAJEN HALDAR .... ITI

ICT INSTRUCTER

1. TARIK AJIJ, ... M.A

CASUAL WORKER

1. SUKLA ROY ....
2. BISWAJIT PATHAK ....
3. SAMIRAN DAS ....
4. MUKUL SINGHA ....
5. CHANDAN HALDAR ....

ADMINISTRATOR : NIBEDITA GHOSH, S.I, LALGOLA CIRCLE

বিগত তিন বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

Madhyamik Result : 2026
Appeared : 249
Passed : 247
1. Farhan Absar - 669
2. Agnibhakrishna Bhaduri - 666
3. Biswarup Baskey - 663

Madhyamik Result : 2025
Appeared : 278
Passed : 275
1. Sakibur Rahaman - 641

Madhyamik Result : 2024
Appeared : 197
Passed : 197
1. Rakesh Haldar - 617

Higher Secondary Result : 2026
Appeared : Boys - 175, Girls - 61
Passed : Boys - 173, Girls - 61
1. Sangita Mahanto - 472
2. Tahamida Khatun - 468
3. Tania Sultana - 458

Higher Secondary Result : 2025
Appeared : 213
Passed : 213
1. Mousumi Saha - 472
2. Dip Haldar - 461
3. Surya Prasad Mandal - 421

Higher Secondary Result : 2024
Appeared : Boys - 219, Girls - 51
Passed : Boys - 219, Girls - 48
1. Subrata Haldar - 461
2. Sanat Karmakar - 458
3. Rahul Haldar - 453

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- ❑ রাজ্য স্তরে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার (২০২২)
- ❑ ক্রিকেটে জেলা চাম্পিয়ান (২০২৪)
- ❑ মডেল প্রতিযোগিতায় রাজ্যে দ্বিতীয় (২০২৪)।
- ❑ অদ্রিজ চৌবে - ক্যারাটেতে 9th, 10th International Champion (2025, 2026) and All Indian Federation Cup Champion
- ❑ ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জেলাতে NCC-তে দ্বিতীয় পুরস্কার (২০২৬)
- ❑ বিদ্যুৎ হালদার - স্কুল ক্রিকেটে রাজ্য দলের প্লেয়ার।
- ❑ ফুটবলে - সুব্রতকাপে জেলায় রানার্স (২০২৬)।

সূচিপত্র ...

শিরোনাম	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	সম্বল কুমার ঘোষ	৯
প্রধান শিক্ষকের কলমে	অরুণ কুমার দাস	১১
কবিতা		
Wish to Live	Anup Kumar Pal	১৩
Maa	Md. Ishan Saught	১৩
যন্ত্র সভ্যতার যুগ	রাধাগোবিন্দ রায়	১৪
নতুন দিনের নাম	জোহাইরা	১৪
সময়	রতন ঘোষ	১৫
গোপালবাবুর গোঁফ	মাহির চৌধুরী	১৫
বন্ধু	বিনিত সরকাব	১৫
নতুন আলো	শুভ্র বোস	১৬
সুখ সুবাস	বরুণ কুমার দাস	১৬
আমাদের লালগোলা ও আমাদের স্কুল	অভ্রনীল পাল	১৭
স্মৃতিচারণ	পৌষালী পান্ডে	১৭
মুরমু ঠীকরীনেরা রাষ্ট্রপতি-এ দারায় কান্	সোম কিস্কু	১৮
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ		
বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য	জাহাঙ্গীর মিঞা	২১
মহাকালের গহনে এক ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী	অভিজিৎ সান্যাল	২৪
গল্প		
প্রেসক্রিপশন	মহম্মদ আলামিন	২৭
জাদুর কলসি	অর্পিত হালদার	২৮
অহংকার	অরিত্র দাস	২৯
গাছ ও মানুষের গল্প	অন্বয় মুখার্জ্জী	২৯
নিখোঁজ সংবাদ	নীহারুল ইসলাম	৩০
জন্মদিন	রবীন্দ্রনাথ সরকার	৩৩
বিপদের কথা	অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়	৩৬
শেষ কবরের পাশে	মোঃ জিয়াউর রহমান	৩৮
এক টুকরো ক্ষীণ আলো এবং একটি বুলডোজারের গল্প	ইমতিয়াজ আহমেদ	৪৪

সূচিপত্র ...

শিরোনাম	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
স্মৃতিচারণ		
শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক ঃ স্মৃতি, শ্রদ্ধা ও স্বপ্নের ঠিকানায়	জগদীশ সাহা..........................	৪৭
স্মৃতির বৃষ্টিতে ভিজে	দোদুল রায়..............................	৪৯
উৎকর্ষতার খোঁজে বিদ্যামন্দিরের সেকাল ও একাল	উজ্জ্বল কুমার মিত্র	৫০
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী মদন মোহন রায় ঃ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব..	সুখেন্দু কুমার রায়	৫৪
লালগোলা এম.এন. একাডেমি আমার জীবন বোধের উৎস ভূমি	শ্রী কিষাণ চাঁদ ভকত	৫৮
তিন দশক পেরিয়ে স্বপ্নের আঙিনায়..............................	বিনোদ কুমার ভকত....................	৬০
আমার প্রিয় লালগোলা এম.এন একাডেমি	তরুণ কুমার মন্ডল	৬২
অবসরের পরেও কেন স্কুলে যাই	বিরিঞ্চি কুমার হালদার................	৬৪
লালগোলা এম.এন. একাডেমি ও আমি	অর্ণব রায়..................................	৬৮
গৌরবে গাঁথা লালগোলা এম.এন. একাডেমি..................	স্বপন কুমার সাহা	৭১
হে অতীত কথা কও	স্বপন কুমার পান্ডে......................	৭৩
আমার স্মৃতিতে এম.এন একাডেমি	জীবনকুমার বসু	৭৮
ভ্রমণ কাহিনি		
আমার আন্দামান ভ্রমণের দিনগুলি	সোহম দাস	৮২
দার্জিলিং ভ্রমণ..	এ.এন.আশফাক আলী	৮৪
আমার প্রথম ট্রেকিং অভিজ্ঞতা	জাহাঙ্গীর হোসেন......................	৮৫
চার দেওয়ালের বাইরে ‘ম্যায় হুঁ না’	সাফিকুর রহমান	৯২
প্রবন্ধ		
এক ছিন্নমূল যেভাবে কবিতা পড়ে..................................	অরিত্র সান্যাল..........................	৯৬
“যোগেন্দ্রনারায়ণ নাকি যোগীন্দ্রনারায়ণ” - এক বিতর্ক......	সুমন কুমার মিত্র.........................	৯৯
ইন্দির ঠাকরুণ ঃ নিরাপত্তা হীন মানুষের জীবন কৌশল এবং মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট --- এক সাহিত্যিক ও সমাজ বাস্তব বিশ্লেষণ..	নাসরিন বানু শেলী	১০১
আপসহীন শিল্পী অরিজিৎ সিং..	সম্বল কুমার ঘোষ	১০৬
বিভিন্ন পুরস্কারের নামের তালিকা	....	১১০

সম্পাদকীয়

'মৌন-মুখর'

"এত মেঘের কোণে কোণে /এলো বাতাস হু হু শনে / রিমঝিম ঝিম রিমঝিম বৃষ্টি /........
ওগো বৃষ্টি তুমি মিষ্টি।"

প্রায় এক যুগ পরে আমাদের বিদ্যালয়ে আজ এক পশলা বৃষ্টির আমেজ। বলাই বাহুল্য আকাশ থেকে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ার কথা বলা হচ্ছে না এখানে, ঝরে পড়ছে এক ঝাঁক কচি প্রাণের এতদিন ধরে জমে থাকা শব্দহীন গুঞ্জন, কাগজের পাতায় চুঁইয়ে পড়ছে এক যুগ ধরে জমিয়ে রাখা অপ্রকাশিত সব কথামালা।

এই বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের শিক্ষকতা জীবনে আমি সময়ের অনেক চড়াই-উতরাই দেখেছি। তবে গত একযুগ আমাদের এই প্রাণের প্রকাশগুলো যেন এক অদ্ভুত নীরবতায় থমকে ছিলো। বিশেষ করে 'করোনা'র সেই বিশ্বব্যাপী ছন্দপতন আমাদের চেনা জীবনের হাসি-গানকে এক লহমায় থামিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই মহামারির গ্লানি আর দীর্ঘ এক যুগের নীরবতা সরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কলম আবার মুখর হয়ে উঠেছে। তাদের প্রাণের স্পন্দন ধরা পড়েছে পত্রিকার পাতায় পাতায়।

লোকে বলে এখনকার প্রজন্ম নাকি কেবল ডিজিটাল স্ক্রিনের নীল আলোয় বুঁদ হয়ে থাকে কিন্তু পত্রিকার পাতা উল্টাতে গেলে দেখা যাবে ... এই সৃজনশীলতা, কোনো যান্ত্রিক 'অ্যালগরিদম' তৈরি করতে পারে না। আজ তাই এম.এন.একাডেমির আঙিনায় জেগে উঠেছে কলকাকলি -

"আম গাছের ওই মগডালেতে
আজকে ওদের জলসা হবে
ময়না-টিয়া-দোয়েল-ফিঙে
সকলে আজ গান শোনাবে।"

শুধু বর্তমান নয় এই আয়োজনে শামিল হয়েছেন আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররাও। তাঁদের স্মৃতিমেদুর লেখাগুলো মনে করিয়ে দেয় একাডেমি ছেড়ে গেলেও শিকড়টা রয়ে গেছে এখানেই। সেই সঙ্গে এই সংকলনকে ঋদ্ধ করেছেন আমাদের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক মন্ডলী। তাঁদের অভিজ্ঞ কলম আর আশীর্বাদ এই পত্রিকাকে এক গভীর মমতা ও নির্ভরতা দিয়েছে।

তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটি হল আমাদের ক্ষুদে শিল্পীদের বিভাগ। সেখানে কেবল রঙ আর পেন্সিলের টান নেই, আছে নিষ্পাপ স্বপ্নের এক আলপনা। তাদের আঁকা ছবিগুলো যেন "উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা" হয়ে "সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে / চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।"

পাঠকেরা, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ও আঁকাতে নিশ্চয়ই নিখুঁত বিশ্বমানের সাহিত্য বা শিল্পকর্ম খুঁজতে যাবেন না বরং খুঁজবেন সেই প্রাণশক্তিকে যা দীর্ঘ এক যুগ পর আবার ডানা মেলতে চাইছে। এখানে ভুল আছে, কাঁচা হাতের টান আছে কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে প্রাণের স্পন্দন।

যাঁদের লেখা ও পরিশ্রমকে মূলধন করে এই পত্রিকা আজ আলোর মুখ দেখতে চলেছে তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস যেন আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থেকে সৃজনশীল যাত্রাকে সচল রাখে, এই প্রত্যাশা রইল।

স্মরণ

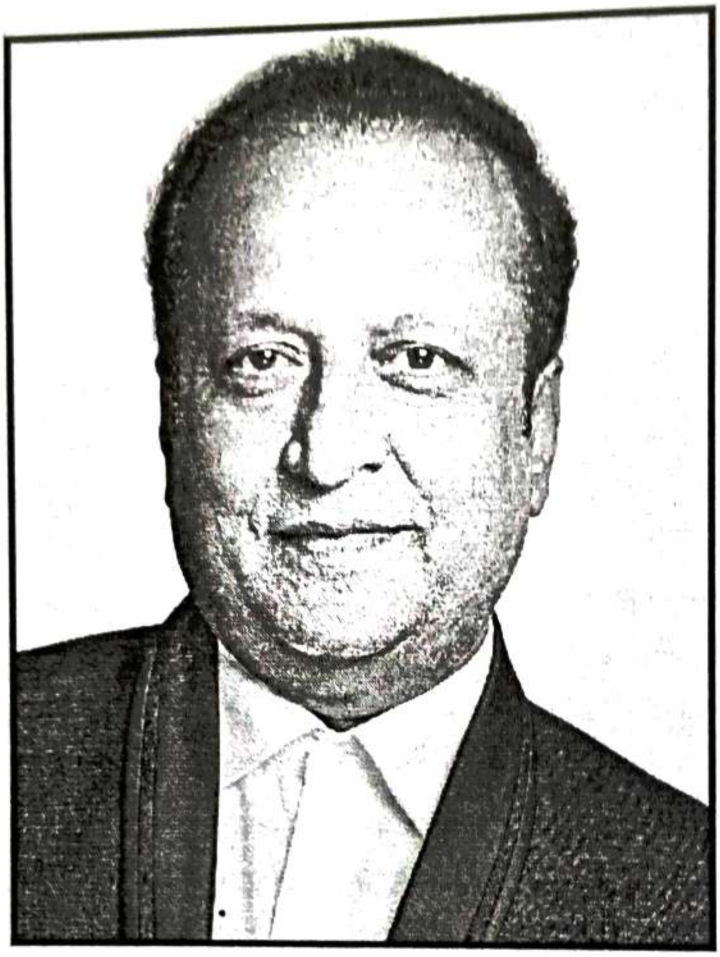

তপন কুমার দত্ত

জন্ম ঃ ১৬/০৯/১৯৭২ ।। প্রয়াণ ঃ ০২/০৮/২০২৪

"অকালে নিঃস্ব করে এই চলে যাওয়া
অকালে যেভাবে ঝরে পড়ে হেমন্তের ধান
শূন্য বুকে থাক অন্তহীন বালিয়াড়ি
শুধু মনে রেখো মুছে দিয়ে সব অভিমান।"

লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমির পক্ষ থেকে
সকল শিক্ষিকা, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

প্রধান শিক্ষকের কলমে

সীমার মাঝে অসীম তুমি

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী লালগোলা ব্লকে অবস্থিত লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমি একটি ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ বাংলায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় তার পিতা মহেশ নারায়ণের নামে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে (১৯১৪ থেকে) এই বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত (Government Sponsored) বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়-এর প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার। পরবর্তীকালে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমার মাস্টারমশাই মদনমোহন রায়। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্য দর্শন, মন ভোলানো হাসি ও স্নেহপ্রবণ একজন প্রকৃত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করেছি। তার রসিকতা সর্বজনবিদিত। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে, সই করে নিতে হবে। কিন্তু সেদিন সঙ্গে আমার পেন ছিল না। হেড স্যার সই করিয়ে এডমিট কার্ড তুলে দিচ্ছিলেন। কুণ্ঠিতভাবে স্যারকে, তার ফাউন্টেন পেনটি চাইলাম। স্যার দিলেন এবং বললেন "তোমার নাম 'অর্জুন' হলে আমি দিতাম না।" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেন স্যার? উনি বললেন "ওই অর্জুনের 'রেফ' দিতে গিয়ে যদি তুমি আমার পেনের নিব ভেঙে দাও।" তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। এইরকম অনেক স্মৃতি ভেসে আসছে। আমার কাছে নক্ষত্রের মতো আমার শিক্ষক মশাইরা। মনে পড়ে সেই সমস্ত শিক্ষকদের স্নেহ ভরা ডাক। শান্তিবাবু, গোপালবাবু, শম্ভুবাবু, দিবাকরবাবু, বিকাশবাবু, পণ্ডিতবাবু, শিবেনবাবু, ফটিকবাবু, আনন্দবাবু, অনাথবাবু, মনোজবাবু, পান্ডেবাবু, নকুলেশ্বরবাবু, নিরঞ্জনবাবু, মন্টুবাবু, সুখেনবাবু, মহিমাবাবু, তরুণবাবু, পাঁচকড়িবাবু, রনেনবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, রমেশবাবু, অলকবাবু, স্বপনবাবু, মধুবাবু, নিলয়বাবু, প্রশান্তবাবু, অলোকবাবু, শান্তসৌম মৌলভী সাহেব এবং আরও অনেকে। মনে পড়ে বিষ্টুদা, সতীশদা, রঞ্জিতদা, অশোকদা, লাল্টুদাকে। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় ফেলা আসা দিনে। সকালে স্কুল, কামিনী ফুলের সুবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠৎ চমকে উঠি "এই যে চাঁদ, ভুত ছুটিয়ে দেব"। অথবা "এই যে স্যার"। হারিয়ে যাওয়া সময় শুধুই স্মৃতি। একেকটি নাম আমার কাছে নক্ষত্রের মতো। ছাত্রাবস্থায় যাদের ভয়ে দূরে থাকতাম, একদিন তারাই বন্ধুর মত মিশতেন। ভালবাসতেন।

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান

আমার জন্মের দু'বছর আগে যে বিদ্যালয় ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত। শতবর্ষ একটি সংখ্যা মাত্র নয়। বরং এক শতাব্দী ধরে হাজারো প্রাণের স্বপ্ন সাধনা এবং সাফল্যের মহাকাব্য।

বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে আপ্লুত এবং গর্বিত। আমার এই গর্বের জায়গাটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যখন মনে পড়ে - আমি শুধু এই চেয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি নয়, এই পুণ্যভূমির একসময়ের ধুলোবালি মাখা এক প্রাক্তন ছাত্র। যখন সেই পুরনো স্মৃতিগুলোকে

সঙ্গে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে এসে বসি, প্রতিমুহূর্তে অনুভব করি এক বিশাল দায়বদ্ধতা। দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা প্রাক্তনীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গঠন করি 'প্রাক্তনী সংসদ'। আমার অগ্রজ, বন্ধু এবং অনুজদের চরম উৎসাহ ও ভালবাসাকে পাথেয় করে বিদ্যালয়ে শ্রী বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। নির্মাণ হয়েছে একটি আর্ট গ্যালারি, মহারাজার পূর্ণাবয়ব স্ট্যাচু, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও আরো অনেক কিছু। পরবর্তীকালে সংযোজন হয়েছে একটি আধুনিক সাইন্স মিউজিয়াম। শুভরঞ্জনদা, সমীরদা, গোলামদা, আশিসদা, মানাদা, হরিরামদা, মানবদা, মাইনুদ্দিন, উজ্জ্বল, উত্তম, খোকন, তাপস, অজয়, দীনেশ, সমীর, অমিত, কপোত, রতন, মিজানুর ও আরও অনেকের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মিলন ঘোষ, নির্ঝর সিংহ, অন্য সদস্য মনসুরদা, কুন্তল, তাসিকুল, রাকিব, কবির, সাহিদুজামান, সর্বোপরি আমার স্যার সুখেনবাবু, ওঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমি সহকর্মীদের প্রতি চিরঋণী। তাদের সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে। আর একজনের নাম বলতেই হয়, তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বিরিঞ্চি কুমার হালদার। যদিও প্রাক্তন শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখনও তিনি নিয়মিত স্কুলে আসেন এবং অফিসের কাজকর্মগুলি নিঃশব্দে ও নিপুণভাবে করে যান। তাঁর প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। স্কুলের অন্যতম স্তম্ভ সমীর, শুক্লা, পাঠক তোমাদের অকৃত্রিম ভালবাসা বিদ্যালয়কে আরও সুন্দর করেছে। ধন্যবাদ জানাই সরস্বতদি ও তাঁর দলকে। যাঁদের নিপুর হাতের মাধুর্যে বিদ্যালয়ের দ্বি-প্রহরিক আহার (PM Poshan) একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

আপনারে দীপ করি জ্বালো, আপনার যাত্রাপথে আপনি দিতে হবে আলো ঃ

যুগের পরিবর্তন হয়েছে। খাতা-কলমের পাশাপাশি আজ ব্ল্যাকবোর্ডের জায়গা নিয়েছে ডিজিটাল স্ক্রিন, হাতে কলমে শিক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে ইউনিসেফ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত 'STEM Lab' কিন্তু আমাদের মূল আদর্শ ও ঐতিহ্য আজও একই রয়ে গেছে। আমরা শুধু তথাকথিত ভালো ছাত্র তৈরি করতে চাইনি। আমরা চেয়েছি সুনাগরিক এবং সংবেদশীল মানুষ তৈরি করতে। আমাদের প্রাক্তনীরা আজ দেশ বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেধা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতেই হয় আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অশোক কুমার হালদারের নাম। যিনি এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন এবং আমাদের বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছেন।

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা ঃ

আগামী দিনের সংকল্প হোক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় দীক্ষিত করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করা। পাশাপাশি বিদ্যালয়কে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা। এর অনুষঙ্গে আমরা একটি "প্রজাপতি সংরক্ষণ বাগান" করেছি। এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জীব বৈচিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় হয়েছে।

আজকের শিশু, আগামী সুনাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা — তোমরা স্বপ্ন দেখো, আকাশ ছোঁয়ার ডানাকে প্রসারিত করো তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

অরুণ কুমার দাস
প্রধান শিক্ষক

Wish to Live

Anup Kumar Pal (Assistant Teacher)

I long to live thousand days,
To find my smile in sunny rays.
Though pain struck in my throat,
A silent prayer is all wrote.
I dream of laughter, warm and bright,
And stars that shine through every night.
Never bound by earthly time,
Endless hills I choose to climb.
Each sunrise brings a hope to try,
With faith that lifts my spirit high.
Life is a gift, so kind and true,
Filled with moments fresh and new.
To walk ahead and never fear,
Because I know that comfort's near.
My greatest wish is strong and free
I wish to live long here with thee.

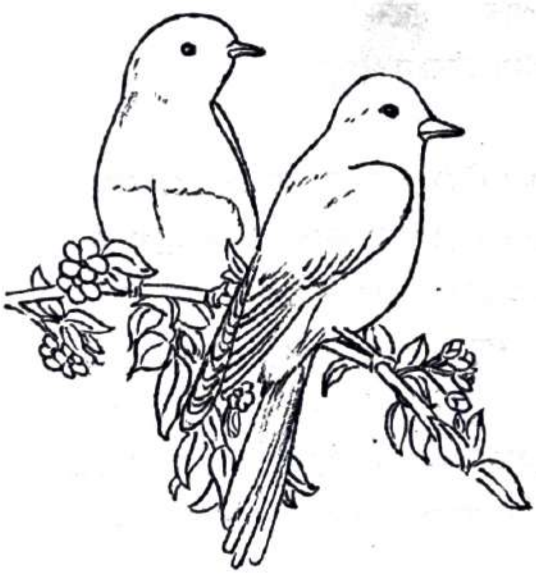

Maa

Md. Ishan Saught (Class VIII)

I was on the lap of her
Fed and grew up
With touch of care.

A ray on my way
And like an way
And like an umbrella
Who always protects me
She is my Maa...

Whenever I remember
I can guess
She looks at me
And a smile on her face.

যন্ত্র সভ্যতার যুগ

রাধাগোবিন্দ রায় (প্রাক্তন ছাত্র)

মোবাইলের যুগ এসেছে
চিঠি লেখা নাই,
এক মিনিটে 'হ্যালো' বলে
খবর নেওয়া যায়।
ক্যালকুলেটার হিসেব কষে
মাথার প্রয়োগ গেছে,
নানারকম কাজ করতে
কম্পিউটার আছে,
লিখতে বেশি চায় না কেউ আর
জেরক্স কপি করে,
অদ্ভুত এক যুগ এসেছে
এই পৃথিবীর 'পরে।

নতুন দিনের নাম

জোহাইরা (দ্বাদশ শ্রেণি)

নীল আকাশে মেঘের ভেলা, ভাসে আপন মনে,
সবুজ ঘাসে শিশির হাসে ভোরের আলোর ক্ষণে।
দোয়েল, শালিক গানের সুরে জাগায় নতুন দিন,
সোনার হাসি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিক রঙিন।।

নদীর বুকে ঢেউয়ের নাচন, বাতাস বয়ে যায়,
গাছের পাতায় রোদের আলো উঁকি দিয়ে বয়।
প্রকৃতি যে মায়ের মতো ভালবাসা দেয়,
ক্লান্ত প্রাণে শান্তি-ছোঁয়া নীরবে ছড়ায়।।

প্রকৃতির কোল লুকিয়ে থাকে জীবনের বহু গান,
পাতার ফাঁকে জাগে যেন নতুন আশার প্রাণ।
দিগন্তের ওই লাল আভাটা নতুন আশার ফুল,
প্রকৃতির এই স্নেহছায়ায় জীবন হোক আকুল।।

সময়

রতন ঘোষ (প্রাক্তন ছাত্র)

ছোটবেলায় স্কুলের মরচেধরা তালাতে
কেরোসিন দেওয়ার যে আনন্দ
অসুস্থ শিক্ষকের জন্য
তুলসীপাতা আর মধু আনার যে আনন্দ
স্বাধীনতার দিনে ফুল দিয়ে মঞ্চ সাজানোর যে আনন্দ
সরস্বতী পুজোতে কোনও দায়িত্ব না পাওয়ার যে কষ্ট
শেষে দেবদারুগাছের তলায় বসে থেকে থেকে
বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফেরা।

গোপালবাবুর গোঁফ

মাহির চৌধুরী (সপ্তম শ্রেণি)

গোপালবাবুর গোঁফ
দেখতে যেন এক্কেবারে বুনোলতার ঝোঁপ।
যদি গোঁফ দেখে কেউ হাসে,
তাইলেই সে ফাঁসে,
কানটি ধরে আনেন তারে,
ড্রেনের জলে চুবিয়ে ছাড়ে।
একদিন গোপালবাবুর গিন্নী এসে
দিলেন গোঁফে কোপ,
সেদিন থেকে গোপালবাবু এক্কেবারে চোপ!

বন্ধু

বিনিত সরকার (সপ্তম শ্রেণি)

সুখের দিনে পাশে থাকে
দুঃখ হলে হাতটি রাখে
সবাই যখন ছেড়ে যায়
বন্ধু শুধুই পাশে দাঁড়ায়।

নতুন আলো

শুভ্র বোস (ষষ্ঠ শ্রেণি)

রাত পোহালো, আলস ছাড়ো,
মেলো দুটি চোখ,
নতুন দিনে নতুন আলো
সবার ভালো হোক।
ঘুম ভেঙে আজ তাকাও চেয়ে,
আঁধার গেল দূরে,
নতুন আলোর গান গেয়ে আজ
চলো জগৎ জুড়ে।

সুখ সুবাস

বরুণ কুমার দাস (প্রাক্তন ছাত্র)

চরাচর ভেসে গেছে
রয়ে গেছে সম্পূর্ণ সুবাস
ভাঙা বৃক্ষের উপরে মাছরাঙা
তার উজ্জ্বল বেগুনী রঙের
অলস দৃশ্যমান ছড়াচ্ছে
কথকতা!
কেউ ভেসে গেছে হঠাৎ প্লাবনে
সহসা মুছে গেছে সুখস্মৃতি,
ঝাপসা হস্তলিপি উদ্ধারে
পুরানো সুবাস রয়ে গেছে
ইতিউতি!

আমাদের লালগোলা ও আমাদের স্কুল

অভ্রনীল পাল (পঞ্চম শ্রেণি)

লালগোলা মোর সোনার গ্রাম, রূপের নাজি শেষ,
সবুজ ধানে ঘেরা মাঠ, দেখতে ভারী বেশ।
পদ্মা নদী বয়ে চলে আপন মনে তাই,
এমন মিষ্টি মধুর গাঁয়ের তুলনা যে নাই।

সেই গ্রামেরই মাঝে আচে জ্ঞানের এক আলো,
যারে আমি আপন জানি, বাসি ভীষণ ভালো।
লালগোলা এম.এন. একাডেমি আমার স্কুলের নাম,
শিক্ষাগুরুর চরণে জানাই শত কোটি প্রণাম।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি আমি, স্বপ্ন বুকে আঁকি,
খেলার মাঠে বন্ধুদের সাথে মনের সুখে থাকি।
ইতিহাসের পাতায় ঘেরা আমারলালগোলা,
স্কুল আর এই গ্রামের স্মৃতি যাবে রবে না কো ভোলা।

স্মৃতিচারণ

পৌষালী পান্ডে (দ্বাদশ শ্রেণি)

প্রতিনিয়ত বয়ে যায় সময়,
আর অনেক নতুন স্মৃতি জমা হয়।
কিছু মনে পড়েনা কিছু মনে পড়ে,
সবথেকে সোনালি দিনগুলি কাটে স্কুল ঘরে,
একদিন আমাদের এই দিনগুলি হারিয়ে যাবে।
শুধু স্মৃতি আর ভালবাসা থাকবে,
মনে পড়ে স্কুল আসার প্রথম দিন।
এই স্মৃতি সারাজীবন হয়ে থাকবে রঙিন,
যেখানে আমি নিচ্ছি শিক্ষা।
কৃতজ্ঞ আমি, করতে পারি না ব্যাখ্যা,
সময়ের নিয়তিতে, সময় দুর্লভ।
তাই স্মৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়াই জানি ফের অসম্ভ।
ভালো থাকুক সমস্ত সহপাঠিরা
ভালো কিছু করবে নিশ্চয় তারা
প্রণাম সমস্ত শিক্ষক নিক্ষাদের
যাঁরা খোজ দিয়েছেন নতুন জগতের।

মুরমু ঠীকরীনেরা রাষ্ট্রপতি-এ দারায় কান্

সোম কিস্কু (প্রাক্তন শিক্ষক)

জাহের বঙ্গা-লেকান দাড়ে তারাস সেঙ্গেল তাম্
আতো ডিভ্ডী দ উড়িষ্যা বাইদাপুসি।
২০ জুন ১৯৮৫ সাল-রে আমাং জনম মাঁহা-রে
নায়ো-বাবা আর বয়হা-মিশিতা-কো এ্যাম্-লেৎ-ক তিনাচং খুশি?
নাপায় অরজ-আতে পাসকাদায়েম্ স্কুল-কলেজ
আর হামেটানাম নানা হুনীর জ্ঞান বাহা নজেল
এতহপ্ লেদাম গিদ্রীক অলঃ সেঁড়া কাঁমি চাকরি মাস্টারি,
পৌর কাউন্সিলর রাজ্যপাল আর হাকো-গাডি মন্ত্রী
সাঁওতে মেনাক্ স্বচ্ছ বিধায়ক কাঁমি,
অনাতেগেচ সারহাও চালাৎ-মেক 'নীলকণ্ঠ এওয়াড সরকারী'।
গজ্গুর হাপাটিঞেনাবেন ছাতার উমুল জুরিপীরি আবেন
সাঁওতে হুডিঞ হুডিঞ বাবার গোটেন বীবু সোনা,
চান্দো বাবা আর বোঙ্গবুরু-কোওয়াঃ গড় ভর দাড়েতে -
মনে জিউয়ি তাম্ দ আঁডি-গে কেটেজাতে
লেবেদ লাটুম্ হিড়িঞ হাপেৎ চাবা কেদায়েম্ দুখ-দান্দি সানাম্ অনা।
উবুল ডুবুল ভারত দিশীম্-রেন হড় আর দিকু যত মানমি করেন,
সন্দাহাড় স সাড়-বাহা লেকায়েম্ ফুটেল্ হিজুঃ কানেম্
আম্-গে রাষ্ট্রপতি,
অসহায় আদিবাসী কোঠেন আঁডি আয়মা আশা-ভরসা তাঁহেন্
সাম্থাড় তিরলী আম্-গে মানতিয়াী দ্রৌপদী।
আমাং গড়-অ সপহৎ বেগের লেঞ্জেৎ-রিন্দিড় ধীরতি রেনাং
নোওয়া জিয়ন ডাহার,
বীনুঃ তাকোয়া বাবাপ্পাওঃ রেনাং-মা দসার জাহান্ গতি।
রেঙ্গেচ্-রাবাংতে টুকুর্ টুকুর্ অড়াঃ দুয়ার টাকা-পুইসাতে -
হঁ গাঁয়ুর টাপুর,
সেদায় যুগ-রেন্ নোকো আদিম খেরওয়াল জাতি।
অওয়ার রাকাব্ কামোমে সুতুঃ লাহা ইদিকোমে
আর জেরেদ আকোমে শিক্ষা-রেনাং মার্শাল বাতি
অনাক দিশী-উইহার তেগেচং নাহাঃ

ধীরতি পুরীরেন মীন্‌মি ক আমাঃ
ঞুতুম্‌তে পুজী জেরেদা - ক, দিনীম্-গে সাঁঝের বাতি।
গুন্‌মানও-সারহাও আর গড্-জোহার, আঁরি চালি মেনাঃ তাবোনা
আবো আদিম সাম্থাড়,
অন্তর মনে-রে জিউয়ি কোচা-রে অনাক-দয়েম্ অতাং দহয়-তালেয়া,
সৃজৗনিয়ায়াঃ নেয়ম্ আঁরি লেকাতে হনাং
লিখন মালং-রে যদি-গে তাহেনাং
অকাহিলীঃ-চং অকা-নাখারেচং ঞেপেল উপ্‌রুম্ হুয়ুঃ-গে তাবোয়া।

মুচাদ

জাহের বঙ্গার (পবিত্র দেবতা) মতো তোমার শক্তি, আর তোমার তেজ যেন আগুনের শিখা,
ওড়িশার বাইদাপুসি গ্রামের এক সাধারণ আঙিনায় তোমার বেড়ে ওঠা।
২০ জুন ১৯৫৮ সালে তোমার জন্মদিনে, মাতা-পিতা আর ভাই-বোনেরা যে কী খুশি হয়েছিল!
ভালো ফল নিয়ে তুমি স্কুল-কলেজ পাস করলে,
শুরু করলে শিশুদের পড়ানোর মহান শিক্ষকতা পেশা।
অর্জিত জ্ঞানের আলোয় তুমি হলে কাউন্সিলর, রাজ্যপাল এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী।
বিধায়ক হিসেবে তোমার স্বচ্ছ কাজের জন্যই তুমি পেয়েছ সরকারি 'নীলকণ্ঠ পুরস্কার'।
সংসার জীবনে প্রিয়জনকে হারানোর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল তোমার ওপর,
সাথে ছিল তোমার আদরের ছোটো দুই সন্তান।
কিন্তু ঈশ্বর আর বোঙ্গাবুরুদের আশীর্বাদে তোমার মনের শক্তি অটুট ছিল,
পায়ের নীচে সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে পদ দলিত করে তুমি এগিয়ে চলেছ।
আজ সারা ভারতবাসীর কাছে - সে আদিবাসী হোক বা অ-আদিবাসী হোক্
তুমি এক প্রস্ফুটিত সর্যে ফুলের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছ।
তুমিই আমাদের রাষ্ট্রপতি,
অসহায় আদিবাসীদের আশা-ভরসার প্রতীক, মহীয়সী নারী দ্রৌপদী।
তোমার সেই সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ জীবনের পথে,
নিরাশ্রয় মানুষের জন্য তুমিই হবে একমাত্র গতি।
অভাব-অনটন আর দারিদ্রের মধ্যে ধুঁকতে থাকা সেই আদিম খেরওয়াল (সাঁওতাল) জাতি,
তাদের উদ্ধার করো, প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলো।
তাদের মনে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, এই লক্ষ্যেই তোমার পথচলা।
পৃথিবীর মানুষ আজ তোমার নামে শ্রদ্ধা জানায়,
প্রতিদিন সাঁঝের বাতি জ্বেলে তোমার মঙ্গল কামনা করে।
আমাদের আদিবাসী সাঁওতালদের যে সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার আছে,
তুমি তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আমাদের সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করো।

সৃষ্টিকর্তার নিয়ম অনুসারে আমাদের নিয়তি যদি সহায় থাকে,
তবে একদিন সাফল্যের আলোয় আমাদের এই জাতি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

মূলভাব ঃ
এই কবিতায় দ্রৌপদী মুর্মুর জীবনসংগ্রাম, তাঁর রাজনৈতিক উত্থান এবং ভারতের সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিগত শোককে জয় করে কীভাবে তিনি আজ সমগ্র পিছিয়ে পড়া জনজাতির (আদিবাসী সমাজের) কাছে এক আলোর দিশারি হয়ে উঠেছেন, সেই বন্দনাই এখানে করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য

জাহাঙ্গীর মিঞা (সহকারী শিক্ষক)

আপনি প্রকৃতিতে সুন্দর বলে যা দেখেন বা যেখানে আপনি নান্দনিকতা খুঁজে পান তা আসলে বিজ্ঞান। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় যখন বাইরের কোনো উদ্দীপনায় বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং সেই উদ্দীপনা যদি আমাদের আনন্দ বা তৃপ্তি দেয়, তাকেই আমরা সাধারণত সৌন্দর্য বলি। আমরা যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখি, তখন কী দেখি? মূলত তার জ্যামিতিক আকার/গঠন, রং দেখি অথবা শব্দ শুনি কোথাও আবার স্পর্শ করে বা গন্ধ শুঁকে বলি এটা সুন্দর। প্রকৃতির এই সকল সৌন্দর্যের পিছনে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের সৌন্দর্য। কেউ অবশ্য ঘুরিয়ে বলতে পারেন বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিজ্ঞান হল তথ্য, যুক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমীকরণের একটা বিস্তীর্ণ জগৎ। অন্যদিকে, সৌন্দর্য হল অনুভূতি, নান্দনিকতা, শিল্প এবং হৃদয়ের ছোঁয়া। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য একই মুদ্রার দুটি পিঠ। বিজ্ঞানের দীর্ঘ যাত্রার মূল উদ্দেশ্যই হল পরম সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই সত্যের খোঁজ করে আসছে এবং আগামীদিনেও করবে। বিজ্ঞানসম্মত এই সত্যই হল সৌন্দর্য।

কয়েকটি সহজ উদাহরণই দিই ঃ

১। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি পুরুষ ময়ূর বা অন্যান্য পশুপাখি দেখতে সুন্দর হল কেন? বা মিষ্টি সুরে আওয়াজ করতে পারে কেন? আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে ফুলগুলো উজ্জ্বল রঙের অথবা সুন্দর গন্ধের হল কেন? ডারউইনের মতে, প্রকৃতিতে আমরা এই যে সৌন্দর্য দেখি তা কেবল দেখার আনন্দের জন্য তৈরি হয়নি। এই সৌন্দর্য আসলে "যোগ্যতমের টিকে থাকা" (Survival of the Fittest) এবং নিজের বংশধারাকে টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে তৈরি হয়েছে। ময়ূরের পেখম বা হরিণের সুন্দর শিং ... এগুলো সৌন্দর্যের প্রতীক, যা মূলত বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য বিবর্তিত হয়েছে। জোনাকি যে সুন্দর আলো জ্বালায় সেটা রসায়নের একটি অদ্ভুত খেলা যার মূল উদ্দেশ্য হল সঙ্গীকে আকৃষ্ট করা। যে বেশি আলো জ্বালাতে পারবে সে তত বেশি সুন্দর, তার সঙ্গী পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি ফলে পরবর্তী প্রজন্মটিকে থাকার সম্ভাবনাও বেশি। যারা সুন্দর ছিল তারা টিকে গেছে, যারা সুন্দর ছিল না তারা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি এবং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রকৃতিতে আমরা যা দেখি এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের সামনে অবস্থান করছে।

২। বিজ্ঞানে প্রতিসাম্য (Symmetry) কে সৌন্দর্যের একটি বড়ো মাপকাঠি ধরা হয়। মানুষের মুখ বা শরীরের বাম এবং ডান দিক যত বেশি নিখুঁতভাবে মিলে যায়, তাকে আমাদের মস্তিষ্ক তত বেশি সুন্দর মনে করে। এর কারণ, নিখুঁত প্রতিসাম্য ভালো জিন, সুস্থতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। প্রতিসাম্যের সাথে ভরকেন্দ্রেরও কিছুটা যোগ আছে। যে গাছ চারিদিকে সমান হয় না অর্থাৎ Symmetric হয় না, তার ভার বা ওজন কাণ্ডের মাঝখান দিয়ে নামে না। ফলে ঝড় হলে সেই গাছ উল্টে পড়ার সম্ভাবনা বেশি অর্থাৎ টিকে থাকার জন্য গাছটি নিজেকে symmetic করতে চাইবে আর এই symmetry আমাদের মস্তিষ্কে নান্দনিকতার জন্ম দেবে।

৩। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি আমাদের হাতের আঙুলের হাড়ের অনুপাত 2 : 3 : 5 : .... হল কেন? ফুলের পাঁপড়ির নির্দিষ্ট সংখ্যা বা সূর্যমুখী ফুলের ভেতরের ফ্লোরেটগুলো ওভাবে সাজানো থাকে কেন? শামুকের খোলস বা গ্যালাক্সির প্যাটার্ন দেখতে সুন্দর এবং একই রকম হয় কেন? আসলে এগুলো ফিবোনাচ্চি সর্পিল (Fibonacci Spiral) যা ফিবোনাচ্চি সিরিজ – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 (এখানে প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল) মেনে তৈরি হয়েছে। প্রকৃতিতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলোয় এই সংখ্যার খেলা বা জ্যামিতিক নকশা শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, এর পেছনে আছে বিজ্ঞান। যেমন মানুষের হাত ফিবোনাচ্চি অনুপাতে হওয়ার কারণে তারা যে-কোনো বস্তু (যেমন ঃ কলম, হাতুড়ি বা গাছের ডাল) সবচেয়ে কার্যকরভাবে এবং কম শক্তি খরচ করে আঁকড়ে ধরতে পারে।

৪। আমরা স্কুলে যে জ্যামিতি শিখি (বৃত্ত, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র ...) প্রকৃতি কিন্তু তার চেয়ে অনেক জটিল জ্যামিতি পছন্দ করে। সেটা হল ফ্র্যাক্টাল জ্যামিতি (Fractal Geometry) এটা এমন এক জ্যামিতিক গঠন যা ভাঙলে বা জুম করলে হুবহু একই রকম দেখতে ছোটো ছোটো গঠন পাওয়া যায়। মেঘ, পাহাড়, নদীর গতিপথ, গাছের ডালপালা, ফুলকপি বা আমাদের ফুসফুসের রক্তনালী একই জ্যামিতিক নিয়ম (Self similarity) মেনে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব উদ্ভিদের পাতা ফ্র্যাক্টাল আকৃতির (যেমন ধরুন ফার্ণ গাছ), তারা সূর্যের আলো এবং বাতাস অনেক বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে ফলে এরা সহজে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারে। নদী এঁকেবেঁকে যায় দেখতে সুন্দর লাগে, আসলে নদী এমন পথ খোঁজে যে-পথ দিয়ে জল বয়ে নিয়ে গেলে শক্তির অপচয় সবচেয়ে কম হয়।

৫। আমরা চারপাশের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখি, কখনো ভেবে দেখেছেন এই সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি (Entropy) সবসময় বাড়ছে অর্থাৎ, প্রকৃতি তার সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে ক্রমশ বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সিস্টেম যত জটিল হয়, সে তার এনট্রপি কমানোর জন্য শক্তি ব্যয় করে। মজার বিষয় হল, আমাদের শরীরের হাজার হাজার জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া বা কোষের গঠন ঠিক রাখতে নিজেদের এনট্রপি কমাচ্ছি, কিন্তু পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে এনট্রপি ছড়িয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের এনট্রপি বাড়ছেই। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী এরউইন শ্রোডিঙ্গার (Erwin Schrodinger) তাঁর গ্রন্থ 'What is Life?' এ আলোচনা করেছেন — জীবন নিজেই একটি লো-এনট্রপি সিস্টেম (Low entropy system), যা চারপাশের উচ্চ-এনট্রপি পরিবেশ থেকে শক্তি গ্রহণ করে নিজেকে সুন্দর ও সুসংগঠিত রাখে। মানুষের শরীর যখন বিকশিত হয়, তারা প্রকৃতির বিশৃঙ্খলার মাঝে বিভিন্ন ঝড় ঝাপটা সামলে বড়ো হয়, অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলার মাঝে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। এই লড়াইটিই হল প্রকৃতির অন্যতম বড়ো সৌন্দর্য। হয়তো মনের ভেতর প্রশ্ন জাগতে পারে কেমন হতো আমরা যদি বুড়ো না হতাম। শীতকাল হলে অনেক গাছের পাতা ঝরে, ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে ঢেউ ভেঙে যায়, সুন্দর ফুল শুকিয়ে যায় — প্রকৃতির কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়, প্রকৃতি কখনো এক জায়গায় স্থির নয়, আর এই এক জায়গায় স্থির নয় বলে প্রকৃতি আমাদের কাছে নান্দনিক হয়ে ওঠে। এই যে ভাঙন বা পরিবর্তন, তা আসলে এনট্রপিরই ফসল।

৬। প্রকৃতি যে কেবল পরিবর্তনশীল তা নয়, প্রকৃতিতে সবসময় অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। 'বৈরাগ্য' কবিতায় কবিগুরু বলেছেন — "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" ভেবে দেখুন আপনি যেটা চেয়েছেন সেটা অনেক সময় হয়নি, যেটা পাওয়ার কথা ছিল সেটা অনেকসময় পাননি। ভেবে দেখুন এই

অনিশ্চয়তাই কিন্তু জীবনকে বৈচিত্র্যময় এবং সুন্দর করে তোলে। যদি সব কিছু আগে থেকে নির্ধারিত থাকত, তবে হয়তো প্রকৃতির এই সৃজনশীল রূপ এবং সৌন্দর্যের এই অসীম সমাহার থাকত না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে 'হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি' (Uncertainty Principle) আমাদের শেখায় যে, যদি আপনি কোনো একটা বিষয়কে ঠিকঠাক পেতে চান তাহলে বাকি বিষয়গুলোকে আপনাকে ছাড়তে হবে। আসলে মহাবিশ্বে কোনোকিছু নিশ্চিত বা সুনির্দিষ্ট নয় বরং সম্ভাবনার (Probability) ওপর ভিত্তি করে আমরা বেঁচে আছি।

এমন উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। আমরা আকাশের নীল রঙের যে শোভা দেখি সেটা আসলে ফোটন কণা এবং বাতাসের অণুর মধ্যে কোয়ান্টাম মিথস্ক্রিয়ার ফল (Rayleigh Scattering) প্রকৃতিতে যখন সুন্দর কিছু দেখি, তখন আমরা আসলে তার গভীর থাকা অদৃশ্য কোয়ান্টাম কোডগুলোকেই অবচেতনভাবে অনভব করি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের জানায় যে, আমরা যা কিছু দেখছি, তা কেবল পদার্থের স্থূল রূপ নয়, বরং এটি হল সম্ভাবনা, তরঙ্গ এবং শক্তির এক অবিরাম নৃত্য। এই নৃত্যের ছন্দই হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আমরা যখন রঙধনু বা নদীতীরে সূর্যাস্ত বা বনের হরিণের গায়ের ডোরকাটা দাগ দেখি অথবা সুন্দর প্রজাপতিকে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে দেখি তখন আসলে আমরা প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা বিজ্ঞানের জীবন্ত সমীকরণগুলোকেই প্রত্যক্ষ করি। আমরা যখন কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই তখন আসলে অবচেতন মনে তার পিছনে থাকা সেই বিজ্ঞানকেই মেনে নিই।

বিজ্ঞানের জয় হোক। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের জয় হোক। সুন্দরের পূজারীদের জয় হোক।

–x–

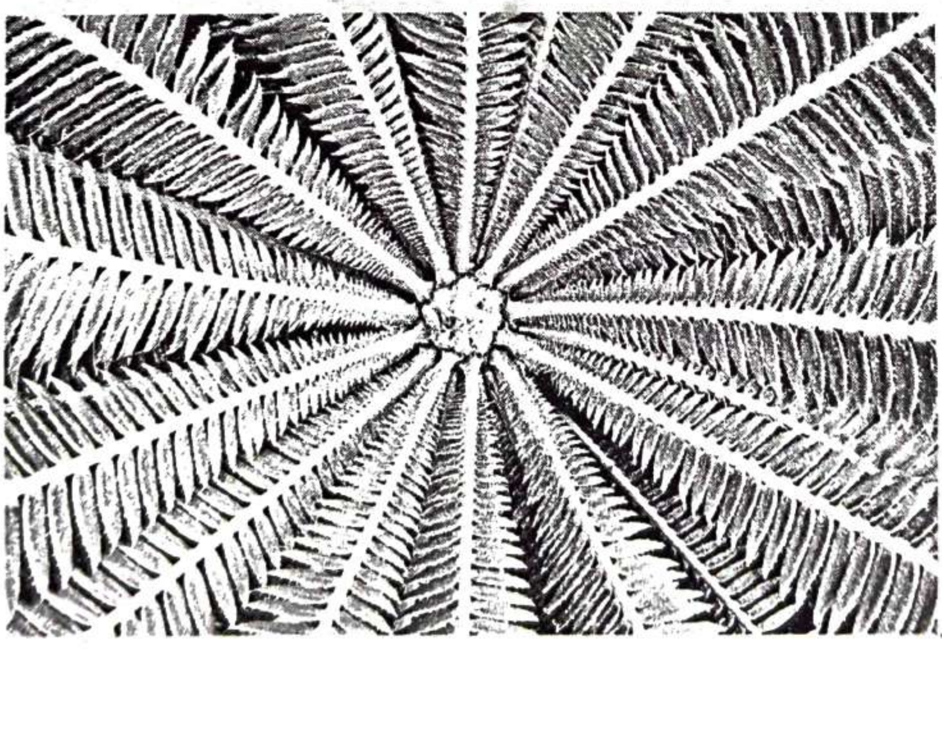

মহাকালের গহনে এক ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী

অভিজিৎ সান্যাল (সহকারী শিক্ষক)

কৃষ্ণাঙ্গ এক ভারতীয় যুবক। ওই দূরের দিগন্তের দিকে চেয়ে বসে আছে জাহাজের ডেকে। পড়ন্ত বিকেল। পশ্চিম আকাশ, গোলাপি, লাল, হলুদ রং মিশে যেন ভ্যান গঘ এর ক্যানভাস। অস্তমিত সূর্যের পানে চেয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনিন্দ কান্তি যুবকটি। হাজার হাজার প্রশ্ন সেই চোখে জমা হয়ে মনের নিউরাল নেটওয়ার্ক-এ তীব্র যানজট সৃষ্টি করেছে। তার গন্তব্য মাদ্রাজ থেকে ইংল্যান্ড। উদ্দেশ্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা স্বামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এজিন্টন ও স্যার রালফ্ হাওয়ার্ড ফাউলার এর অধীনে।

হ্যাঁ। এই সেই আর্থার এডিংটন যিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন কোনো ভরের আশেপাশের দেশ কাল (Space - time), বেঁকে যায়, যা মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর সাধারণ অপেক্ষকতাবাদের মূল উপজীব্য বিষয়।

কৃষ্ণাঙ্গ ওই ভারতীয় হলেন ভারতবর্ষের পদার্থ বিজ্ঞানে একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এর ভাইপো — সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্র শেখর। যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ১৯৮৩ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

এই প্রবন্ধে আমি গাণিতিক সমীকরণ বর্জন করে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করবো সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর -এর আবিষ্কারকে।

মহাবিশ্বে নক্ষত্র সৃষ্টির কারখানা হল নেবুলা বা নীহারিকা। নীহারিকা হল মহাকাশের কোনো স্থানে পুঞ্জিভূত বিপুল পরিমানে হাইড্রোজেন গ্যাসের স্তুপ। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলের বেল্টের দিকে যদি একটা বাইনোকুলার তাক করা যায় তাহলে যে নীলচে ধোঁয়ার মত জিনিসটি দেখা যাবে সেটি আসলে ওরিয়ন নেবুলা। এই হাইড্রোজেন গ্যাসের কণাগুলি মহাকর্ষের টানে কখনো কখনো একে অপরের কাছে আসতে শুরু করে। যত গ্যাসের অণুগুলি কাছাকাছি আসে তত তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকির সংখ্যা বেড়ে যায়। এই ঠোকাঠুকির ফলে অণুগুলির গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে উষ্ণতা বাড়তে থাকে। কারণ গ্যাসের অণুর বেগের সাথে, উষ্ণতার বর্গমূল হয় সমানুপাতিক। এই প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌছায় তখন দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একসাথে জোড়া লেগে হিলিয়াম গ্যাসের নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

একে নিউক্লিও সংযোজন বিনিতয়া (Nuclear fusion) বলে। এই জোড়া লাগার প্রক্রিয়ায় শক্তির মুক্তি ঘটে। সেই শক্তি মূলত তাপশক্তি। এই উৎপন্ন শক্তি গ্যাসের স্তুপ-এর ভেতরে গ্যাস অণুগুলির উষ্ণতাকে বাড়িয়ে দেয় ফলে তাদের ছোটাছুটির করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এই ছোটাছুটি এলোমেলো। তাদেরকে নিয়মে বাঁধা খুব কঠিন।

মহাকর্ষ বল চায় গ্যাসের অণুগুলিকে বেঁধে রাখতে। কিন্তু নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট শক্তি (তাপ) গ্যাস অনুগুলিকে চায় বাইরের দিকে ঠেলতে। এই দুই বিপরীতমুখী প্রকৃয়ার ফলে অণুগুলি একটা অতি বৃহৎ গোলকে পরিণত হয়ে নক্ষত্রের জন্ম দেয়। এটা অনেকটা পৃষ্ঠটান ও বহিঃমুখী অতিরিক্ত চাপের ক্রিয়ার

ফলে সৃষ্ট তরলের ফোঁটা সৃষ্টির মত ব্যাপার।

এখন যে প্রশ্নটা মনের গহনে আঘাত করবে তা হল এই হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা কতদিন চলবে ? এই নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিয়া বন্ধ হলে কি হবে ? এই প্রশ্নগুলি একদা ভাবিয়েছিল সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখরকেও। তিনি অঙ্ক কষে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এবার আমরা সেগুলি জানব। যদি এই লেখা পড়ে কোনো পাঠক বা পাঠিকার অন্তরে ইচ্ছে হয় অঙ্ক কষার তাহলে তাকে পড়াশোনা করতে হবে Cosmology নিয়ে।

নক্ষত্র যত বড়ো হয়, তার সেই বিশাল অবস্থাকে ধরে রাখতে তাকে তত বেশি পরিমাণ জ্বালানি খরচ করতে হয়। একটি নক্ষত্রের বুকে প্রচুর পরিমানে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকলেও তার পরিমাণ অনন্ত নয়। যখন নক্ষত্রের সমস্ত হাইড্রোজেন-এর নিউক্লিয়াস হিলিয়াম তৈরি করে তখন নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে যায়। সাময়িকভাবে। এর ফলে নক্ষত্রের ভেতর বহির্মুখী যে দুটি চাপ ছিল অর্থাৎ তাপশক্তির কারণে বাইরের দিকে কণাগুলি দ্বারা প্রযুক্ত চাপ এবং ফোটন কণা (আলোর কোয়ান্টা) দ্বারা প্রযুক্ত বহিঃমুখী বিকরণ চাপ যায় কমে। মহাকর্ষের কারণে তখন নক্ষত্রের মধ্যস্থিত প্লাজমা কণা একে অপরের কাছাকাছি আসতে থাকে। যত কাছাকাছি আসতে থাকে ততো আগের মত ঠোকাঠুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাপশক্তি তথা উষ্ণতা বাড়তে শুরু করে। উষ্ণতা একটি নির্দিষ্ট উচ্চ স্তরে পৌঁছালে দুটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস-এর সংযুক্তি ঘটে। এর ফলে কার্বন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। তখন ফের বিপুল তাপশক্তির জন্ম হয়। যার দরুণ বহির্মুখী চাপ বৃদ্ধি পায়। তখন নক্ষত্রটি ফুলতে শুরু করে, এবং তার আকার প্রাথমিক আকার-এর থেকেও বেশি হয়ে যায়। আমাদের সূর্যের যখন এই পরিণতি হবে তখন তার ব্যাসার্ধ বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষের ব্যাসার্ধের থেকেও বেশি হবে। বস্তুত তখন পৃথিবী বুধ,শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল সকলকে গিলে ফেলবে। নক্ষত্রের এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় লাল দৈত্য বা Red giant।

কিন্তু এই হিলিয়াম সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ারও একদিন অবসান হবে। তখন মহাকর্ষের কারণে সেই লালদৈত্য আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। এবার কিন্তু ঠোকাঠুকির ফলে এমন উষ্ণতা বাড়বে না যাতে ফের নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিয়া শুরু হয়ে দুটি কার্বন নিউক্লিয়াস-এর সংযুক্তিকরণ হতে পারে।

এখন শুরু হবে এক মজার খেলা। মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রটির আয়তন ক্রমশই কমতে শুরু করবে। বিপুল পরিমাণ ভর ধীরে ধীরে ঠাসাঠাসি করে ঢুকে পড়তে চাইবে ক্ষুদ্র এক পরিসরে। তখন নক্ষত্রের তিনটি পরিনতি ঘটবে। বামন নক্ষত্র, নিউট্রন নক্ষত্র এবং কৃষ্ণগহ্বর বা Black Hole। আমরা এখানে আলোচনা কৃষ্ণগহ্বরেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিযা বন্ধ হলে তার অন্তিম পরিণতি কী হবে সেটা নির্ভর করে জন্মকালে নক্ষত্রটি কতটা বড়ো ছিল তার উপর। আর এখানেই সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখরের যুগান্তকারী আবিষ্কার। যার জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তিনি গাণিতিক ভাবে দেখান যে জন্মকালে যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি তাদের অন্তিম পরিণতি হল কৃষ্ণগহ্বর। আর এই বিশেষ মাপটি চন্দ্রশেখর লিমিট নামে বিখ্যাত।

এবার আসি কীভাবে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হয় সেই প্রসঙ্গে। আমরা জানলাম নক্ষত্রের বুকের ভেতর নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে বাইরের দিকের চাপ যায় কমে ও ভেতরের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সেটি আস্তে আস্তে ছোটো হতে থাকে। এ এক অদ্ভুত পরিণতি। আয়তন প্রায় শূন্য কিন্তু ঘনত্ব প্রায় অসীম। এই বিশেষ অবস্থা পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় Singularity বলে। এমতাবস্থায় পদার্থ বিজ্ঞানের সময় নিয়ম যায়

ভেঙে। বিধাতার বোধ হয় এমন অনিয়ম ঘোর অপছন্দ তাই সিংগুলরিটি থেকে বাঁচার জন্য নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ঘটে এক বিরাট বিস্ফোরণ। একে সুপারনোভা বলে। এই বিস্ফোরণ-এর উজ্জ্বল্য গোটা ব্রহ্মান্ডের উজ্জ্বল্য থেকে বেশি হয়। সেই সুপারনোভা বিস্ফোরণ-এর পরেও ওইসব নক্ষত্রে এতটাই ভর থেকে যায়, তারা মহাকর্ষের প্রভাবে ফের ছোটো হতে শুরু করে। ফলে ঘনত্ব এতটাই বাড়তে শুরু করে যে সেখান থেকে আলো বাইরে বেরোতে পারে না। সেই প্রায় শূন্য আয়তন এবং অসীম ঘনত্বের জায়গা আলোকেও নিজের দিকে টেনে নেয়। আলো বের হতে পারে না বলে তাকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাই সেটি কালো বা কৃষ্ণ। তাই এই বিশেষ অবস্থাটিকে বলা হয় কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল। আমরা বাইরে থেকে অন্য মহাজাগতিক বস্তুর ওপর তার আকর্ষণ বুঝতে পারবো।

আসলে চন্দ্রশেখর এর আগে Karl Schwarzschild নামে এক জার্মান পদার্থবিদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক ও আরেক হাতে পেন্সিল নিয়ে প্রথম সমাধান করেন আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে সমীকরণকে। এই সমাধান থেকে তিনি ব্ল্যাক হোলের ইঙ্গিত পান। পরে সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেকর আরো সঠিক গণনার মাধ্যমে চন্দ্রশেখর লিমিটের সন্ধান পান।

ব্ল্যাকহোলের অন্তরে প্রচুর আলো থাকলেও সেখান থেকে আলো নির্গত হতে পারে না। ব্ল্যাক হোল-এর গহন থেকে উৎসারিত আলো যতটা পথ গিয়ে আবার ভেতরে ফিরে আসে তাকে বলে ইডেন্ট হরাইজন। এই কৃষ্ণ গহ্বরের আশেপাশের মহাশূন্য এতটাই বন্ধ যে তার সামনে সময় যায় থেকে। আমরা যে আকাশগঙ্গা নামক সর্পিল ছায়াপথের বাসিন্দা সেটি ২৮০ কিমি/সে. বেগে কেন্দ্রের সাপেক্ষে ঘুরছে। বিজ্ঞানীদের সবার প্রিয় পদার্থ বিজ্ঞানী স্টীফেন হকিং দেখান যে কৃষ্ণগহ্বর অতো কালো নয়। সেখান থেকেও হয় বিকিরণ। একে হকিং রেডিয়েশন বলে।

আসলে কোনো কৃষ্ণগহ্বরের কাছে অন্য কোনো নক্ষত্র এলে তার ভয়ংকর মহাকর্ষের টানে সেই নক্ষত্রের ভরগুলি ধেয়ে আসে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। রান্না ঘরের বেসিনের জমা জল যখন বেসিনের ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকে তখন তারা এক বৃত্তাকার পথে চক্কর খায়। ঠিক যেমনি নক্ষত্রের দেহ থেকে নির্গত ভর সর্পিল পথে ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে এগিয়ে যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে যে ঠোকাঠুকি হয় তার জন্য সেই সমস্ত কণার শক্তি এতটাই বেড়ে যায় যে তারা কৃষ্ণ গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে জেট এর আকারে মহাশূন্যে নিক্ষেপিত হয়। কৃষ্মগহ্বরের চারপাশে ঘূর্ণায়মান এই ভরকে assertion disc বলে। এই জেটের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলকভাবে পেয়েছেন।

এবার সংক্ষেপে সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে কিছু কথা জেনে নিই।

ভারত থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে জাহাজের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য অঙ্ক কষা শুরু করেন ও চন্দ্রশেখর লিমিটের সন্ধান পান।

তার এই যুগান্তকারী তত্ত্বকে তারই গাইড স্যার এডিংটন অসম্ভব বলেছিলেন। এডিংটন পরিহাসের সুরে তার ছাত্র চন্দ্রশেখরের তত্ত্বকে বলেন "বাধ্যতামূলক আযৌক্তিকতা"। একজন ছাত্রের তত্ত্বকে এভাবে খোলা মঞ্চে বিরোধিতা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল।

১৯৯৯ সালে NASA যে X-Ray Space-telescope মহাকাশে পাঠায় তার নাম রাখা হয় Chandra X-Ray observatory. এই আবিষ্কার-এর ৫৩ বছর পর তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

আমার বিশ্বাস আমরা এই প্রয়াস অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মহাকাশ সম্বন্ধে কৌতুহলের উদ্রেক করবে। এবং সেটা হলে আমার এই ক্ষুদ্র পরিশ্রম সার্থক হবে।

প্রেসক্রিপশন

মহম্মদ আলামিন (সহকারী শিক্ষক)

ডাক্তারবাবু আজকাল সব ভুলে যাচ্ছি। কিছুই মনে রাখতে পারছি না।

ষাটোর্ধ অমিয়বাবুর এই কথার উত্তরে যুবক ডাক্তারবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ নরম সুরে বললেন, "কীরকম একটু বিস্তারিত বলবেন?"

অমিয়বাবু নিজেকে এবার যেন একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "আমি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। শিক্ষকতা জীবনে হাজার হাজার তথ্য আমার ঠোঁটের ডগায় ঝুলত। এখন হঠাৎ করে স্মরণ করতে চাইলে পারি না। আলমারি থেকে বই নামাতে হয়। আর স্মরণ করতে পারি না বলে ভীষণ অস্বস্তি হয়।"

আর কিছু? যেমন, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দেখলেন যে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বা কোনো নিমন্ত্রণ বাড়ি যেতে হতো অথচ বেমালুম ভুলে গেছেন?

না, সেরকম কিছু নয়।

আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কোনো পাবলিশার্সের বই পড়তে পরামর্শ দিতেন?"

সাফল্য পাবলিকেশন।

"অর্থাৎ আপনি সবকিছু ভুলেননি। আর এটা কোনো অসুখও নয়" একথা বলে ডাক্তারবাবু তার সামনে বসে থাকা পেসেন্টের দিকে অদ্ভুত এক সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে বসে রইলেন। ডাক্তারবাবুর ঠোঁটে একটা রহস্যের হাসি, অথচ এই হাসি, তিনি আড়াল করবেন বলে কলম ধরে থাকা ডান হাতটা দিয়ে বেশ কৌশলে ঠোঁটের উপর চাপিয়ে রাখলেন। এবার প্রেসক্রিপশন লেখার পালা। কিন্তু ডাক্তারবাবু চুপ। অমিয়বাবুর কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছেন। স্বস্তি পাচ্ছেন না। মনে মনে ভাবছেন যুবক ডাক্তার কিছু না লিখে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? আজকাল আর এভাবে কেউ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টিতে বিভোর হয় না। একসময় একজন ছিল ... নাহ্ একজন নয়, দু-জন কিংবা ততোধিক। এখন আর কেউ নাই। অতীতের দিনগুলো খুব দ্রুত ঘুরে এসে অমিয়বাবু এবার মুখ খুললেন।

তাহলে আমার জন্য কোনো ওষুধপত্র ...?

অবশ্যই।

খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে গাল ভর্তি এই যুবক ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগলেন। তারপর ডাক দিলেন কম্পাউন্ডারকে। কম্পাউন্ডার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই তার হাতে প্রেসক্রিপশন দিলেন। কম্পাউন্ডারের পেছনে পেছনে অমিয়বাবু ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অমিয়বাবুকে দরজার বাইরে একটা বেঞ্চে বসতে বলে কম্পাউন্ডার আবার একবার ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বেরিয়ে এসে অমিয়বাবুর হাতে প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে দিলেন। অগ্রিম নেওয়া টাকাটা অমিয়বাবুকে ফিরিয়ে দিতে দিতে কম্পাউন্ডার ছেলেটি বলল, "স্যার, এই যে টাকাটা নিন। আপনার কিছুই হয়নি। ডাক্তারবাবু লিখে দিয়েছেন।"

তাহলে প্রেসক্রিপশন!

আমিয়বাবু এবার বিস্মিত হয়ে প্রেসক্রিপশনটার দিকে তাকালেন। দেখলেন তাতে বাংলা অনুচ্ছেদের

আকারে পরিস্কার লেখা আছে -

স্যার, এটা এক ধরনের বয়স জনিত সমস্যা। তবে অসুখ নয়। আপনি না চিনতে পারলেও এই যেমন আমি আপনাকে দিব্যি চিনতে পারলাম, বয়সের হিসেবে এটাই স্বাভাবিক। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আমাকে স্মরণ করতে না পারাটা অস্বাভাবিক বা অসুখ কোনোটাই নয়। আপনার কিচ্ছু হয়নি। আমি বেশ কয়েক বছর বাইরে ছিলাম। কিছুদিন হলো এলাকায় এসেছি। হাসান, প্রসুন ও শুভকে নিয়ে প্ল্যান করেছি সামনেই ৫ তারিখ আপনার বাড়ি যাবো। সেদিন অনেক গল্প করব। আপনার বাড়ির আঙিনায় সেই লেবুগাছটার সুগন্ধ খুব মিস করি। বাড়িতে সবার সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটান। ভালো থাকুন। প্রণাম নেবেন। ইতি — আপনার পুরাতন ছাত্র।

প্রেসক্রিপশনের উপর ডাক্তারবাবুর নাম ও ডিগ্রির লম্বা লাইনটার দিকে তাকিয়ে চেম্বারে দেখা যুবকের মুখটা স্মরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন অমিয়বাবু। আর একটু একটু করে অতীতের পথে পাড়ি দিতে লাগলেন। অনেক ছাত্রের মুখ চোখের সামনে ভাসতে লাগল — কিছু স্পষ্ট, কিছু আবছা, কিছু চঞ্চল, কিছু শান্ত, কিছু দুষ্টু। প্রেসক্রিপশনটা আবার পড়তে লাগলেন আমিয়বাবু। এবার কেমন যেন স্বস্তি লাগছে বেশ।

— x —

জাদুর কলসি

অর্পিত হালদার (ষষ্ঠ শ্রেণি)

একটি কৃষক ছিল। তার খুবই কষ্টে দিন কাটত। একদিন কৃষকটি তার জমিতে চাষ করতে গিয়েছিল। তার চোখে একটি কলসি পড়ল তখন সে কলসিটি বাড়ি নিয়ে চলে গেল। বাড়ি গিয়ে তার বউ বলল আমাকে একটি শাড়ি কিনে দাও। কৃষকটি বলল কাল সকাল হোক, শাড়ি কিনে এনে দিব। কৃষক তার টাকাগুলি ওই কলসিতে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখনই কলসিটির দিকে তাকায় তখনই সে দেখে যে কলসিটির ভেতরে অনেকগুলি টাকা আছে। সে যখন তার বউ-এর শাড়িটি কলসির ভেতরে রাখে তখন তার শাড়ি চার গুণ বেড়ে যায়। একদিন গ্রামের মন্ত্রীর চাকর দুটো তার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে জেনে গেল যে ওটা জাদুর কলসি। রাত্রে যখন কৃষকরা ঘুমাচ্ছিল তখন তারা দুজন সেই কলসিটি নিয়ে মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী বলল, কী হয়েছে? দু'জন বলল, মন্ত্রীমশায় ও যে জঙ্গলের পাশে একটি কৃষকের বাড়ি আছে না! সেই বাড়ি থেকে এই জাদুর কলসিটি পেলাম এই কলসিতে যা রাখা হবে তা চার গুণ বেড়ে যায়। মন্ত্রী বলল ওটা আমাকে দে। ওরা দু'জন বলল আমি দেব না। তারপর মন্ত্রী আর ওরা দু'জন কলসি টানা-টানি করতে গিয়ে কলসির ভেতরে মন্ত্রীর মাথাটা ঢুকে গেল। আর মন্ত্রী মশায়ের মাথা চারটে হয়ে গেল।

— x —

অহংকার

অরিত্র দাস (ষষ্ঠ শ্রেণি)

একদা এক সময় হরিচন্দ্রপুর গ্রামে একটি মাঠ ছিল। সেখানে একটি বড়ো তালগাছ ছিল। তালগাছের নীচে পাঁচ-ছয়টি ছোটো ছোটো ঘাস জন্মেছিল। প্রত্যেকদিন তালগাছটি ছোটো ঘাসগুলিকে বলত আমি কত লম্বা, তোরা কত ছোটো, আমি আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোরা তো ছয় ইঞ্চির গাছ। ছোটো ঘাসগুলির মন খারাপ করতো। এই কথাগুলি শুনে সে গাছটির মনে এত অহংকার হয়েছিল যে, তার পাতাতে কোনো পাখিকে বসতে দিত না, এমনকি কোনো মানুষকে তার ফল দিত না। সামনে গ্রীষ্মকাল, তাল গাছটি তখনো বুঝতে পারেনি আর দশ-কুড়ি দিন পরে ঝড়ে ভেঙে পড়বে।

গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে বিকেল বেলা হঠাৎ কালবৈশাখি ঝড় এল। প্রবল ঝড়ে তালগাছটি লড়াই করতে থাকলো। কিন্তু ঘাসগুলি মাটিতে শুয়ে পড়ল, তালগাছটি চাইলেও মাটিতে শুয়ে যেতে পারতো না। হঠাৎ মট মট করে একটি শব্দ এলো। ঘাসগুলি ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। তখন ঘাসগুলি বলল এত অহংকার করলে ফল কি কারো ভালো হয়?

–x–

গাছ ও মানুষের গল্প

অন্বয় মুখার্জ্জী (ষষ্ঠ শ্রেণি)

একটি গ্রামের পাশে একটা বড়ো আম গাছ ছিল। গাছটি খুবই দয়ালু ছিল। গ্রামের একটি ছেলে প্রতিদিন গাছটির কাছে আসত। সে গাছে চড়ত, আম খেত, আর গাছের ছায়ায় বসে খেলত। গাছটি ছেলেটিকে খুবই ভালোবাসত। ধীরে ধীরে ছেলেটি বড়ো হতে লাগল এবং গাছের কাছে আসা কমিয়ে দিল। একদিন ছেলেটি আবার এল সেই গাছের কাছে। কিন্তু তার মনে দুঃখ। সে বলল আমার টাকার দরকার। গাছটি বলল, আমার কাছে টাকা নেই কিন্তু তুমি আমার আমগুলি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারো। ছেলেটি আমগুলো নিয়ে চলে গেল। গাছটি খুশি হল। সাহায্য করতে পেরেছে। কিছুদিন পর ছেলেটি আবার এল। সে বলল আমার একটা বড়ো বাড়ি দরকার। গাছ বলল, তুমি আমার ডালগুলো কেটে নিয়ে বাড়ি বানাতে পারবে। ছেলেটি ডালগুলি কেটে নিয়ে চলে গেল। গাছ আবার খুশি হল। অনেক বছর পর ছেলেটি বৃদ্ধ হয়ে গেল। একদিন সে এসে বলল, আমি খুবই ক্লান্ত। একটু বসার জায়গা চাই। এবার গাছটি প্রায় শুধু একটি গুঁড়ি হয়ে গেছে। সে মৃদু স্বরে বলল “এসো। আমার উপর বসে বিশ্রাম নাও”। সেই ছেলে বসল ও গাছটি শান্তি অনুভব করল।

–x–

নিখোঁজ সংবাদ

নীহারুল ইসলাম (প্রাক্তন ছাত্র)

ঠিক সন্ধ্যের সময় পণ্ডিতবাড়িতে হইচই। পণ্ডিতসাহেবের পোতা লিটনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে। তারপর খেলতে বেরিয়েছিল। কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে তার সাইকেল কোথায়? বইয়ের ব্যাগ কোথায়? কেউ আবার বলছে স্কুল থেকে নাকি বাড়িই ফেরেনি সে! তাহলে কোথায় গেল? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? আশঙ্কায় সবার বুক কাঁপছে। হইচই তা নিয়েই।

লিটন টাউনের হাইস্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। মাত্র কিছুদিনের মধ্যে পণ্ডিতসাহেবের বড্ড আদুরে হয়ে উঠেছে। কেউ তাকে শাসন করতে পারে না। তার প্রতি পণ্ডিতসাহেবের আস্কারা আছে। তারা পণ্ডিতসাহেবকে সকলে ভয় পায়। বাচ্চাদের প্রসঙ্গে পণ্ডিতসাহেবের কথা, 'বেশি শাসনে বালবাচ্চা বেয়াড়া হয়। বালবাচ্চার বুদ্ধি ভোঁতা হয়। ভালোমন্দের বিচার শেখে না।' এসব যুক্তির কথা কি না, বিচার করে না কেউ। শুধু পণ্ডিতবাড়িতে নয়, এই অঞ্চলে পণ্ডিতসাহেবের কথার যুক্তি খোঁজাটা বেয়াদপির পর্যায়ে পড়ে। একথাও সকলে জানে।

পণ্ডিতসাহেব এমনি খুব কড়া ধাতের মানুষ। অথচ লিটনের কাছে একেবারে নরম কাদার ঢেলা। লিটন যে তার কারণেই সবার মাথায় চড়ে বসেছে কারও তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, লিটন কাউকে, এমন কী — তার দাদীকেও পাত্তা দেয় না। কারও কথা শোনে না। যা ইচ্ছে করে বেড়ায়। ঘুঘু ধরে, পায়রা ধরে, মাছ ধরে, পুকুরে সাঁতার কাটে, গিরগিটি মারে, বাগানে গাছে গাছে ঝুল্লু খায়! এসব করতে গিয়ে পুকুরে কতবার যে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, কতবার গাছ থেকে পড়েছে, তবু তার শিক্ষা হয়নি।

কিন্তু লিটনের এহেন কীর্তির কথা এখন কারও মনে নেই। তার জন্য সবার মন খারাপ। এমন কী তার দাদী নূরনাহার বেগম পর্যন্ত মনখারাপ করে বসে আছে। মা আনুয়ারবিবি তো কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছে। সেজন্য পণ্ডিতসাহেব ডাক্তার ডাকতে তার খাস্ লোক নেষেরকে টাউনে পাঠিয়েছে। ডাক্তার বলতে পন্ডিতসাহেবের বন্ধু লোক, ডা: সান্যালবাবু।

বাড়ির আর সব কাজের লোক, কাজ ফেলে সবাই লিটনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুধু পণ্ডিতসাহেব একা বসে আছে বৈঠকবারান্দায়। তার দাদোর আমলের পুরাতন একটা কাঠের চেয়ারে। পাশের টেবিলের ওপর নিয়ম মতো লণ্ঠনটা জ্বলছে। রেডিওটা আছে। কিন্তু অন্যদিনের মতো সেটা বাজছে না। দিনের খবরের কাগজটাও রাখা আছে ওই টেবিলেই। যার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবসায়ী পুত্রের অপহরণের সংবাদ। স্বাভাবিকভাবেই পণ্ডিতসাহেব খুব চিন্তিত। জোতদার হিসাবে দূর দূর গ্রামে তার নাম আছে। আর দূর দূর গ্রামে আজকাল গুন্ডা-বদমায়েশেরও কমতি নেই। তাহলে তাদেরই কেউ তার পোতাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল না তো?

পণ্ডিতসাহেব ভাবছে। যদিও তার বিশাল আমবাগানের আম চুরি যায় না কখনও। বাঁশবাগানের বাঁশ চুরি যায় না। নুকুচোর পর্যন্ত নহরে মাছ ধরবে বলে তার কাছে বাঁশ চেয়ে নিয়ে যায়। খালি একবার বাড়ির কান্টার পুকুরের সব মাছ মরে সাবাড় হয়েছিল। তাহলে দুষমনি করে কেউ বিষ দিয়েছিল নিশ্চয়! প্রথমে এমন সন্দেহ হলেও পরে জানা যায় পাড়ার ঠোটকাট্টি ছারপোকার কামড়ে ঘুমোতে পারছিল না বলে টাউনের আরসাদহাজীর 'কৃষিভান্ডার' থেকে ফলিডল পাউডার চেয়ে এনে নিজের চৌকি আর বিছানায় আচ্ছা করে

ছিটিয়েছিল। তারপর ছারপোকার বংশ ছারখার হলে তার সেই চৌকি আর বিছানা নিয়ে গিয়ে চুবিয়েছিল পণ্ডিতসাহেবর পুকুরে। তাতেই সব মাছ মরে সাবাড়।

ঠোটকাট্টি নিজেই এসে স্বীকার করেছিল সেই কথা, 'পন্ডিতভাই কিছু মুনে করিও না খো! হামার দোষেই তুমার এত বড় ক্ষতি হুই গেল। ফলিডলে ছারপুকা মরে তা জানতুম, মাছ মরে তা জানতুম না।'

পণ্ডিতসাহেব কিছু মনে করেনি। শুধু লোক লাগিয়ে পুকুর হতে মাছ তুলে পুকুরপাড়ে খাল করে পোঁতার ব্যবস্থা করেছিল। ঠোটকাট্টির নাদানিতে সে এক ঘটনা ঘটেছিল মজ্জাতপুরে! সকলের মনে আছে সেকথা। শুধু পণ্ডিতসাহেবের মনে নেই। সে তার পোতা লিটনের কথা ভাবছে। লিটনের বাপ ইব্রাহিম চাকরি সূত্রে বাইরে থাকে। সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ অন্তর বাড়ি আসে। এখন যদি লিটনের সত্যি সত্যি কিছু হয়ে যায়, কী জবাব দেবে তাকে?

নিজের কপালে ঘামের উপস্থিতি টের পায় পণ্ডিতসাহেব। আর তার মনে পড়ে যায় বহুদিন আগের আর একটা ঘটনার কথা। তার বড় ছেলে ইব্রাহিম তখন লিটনের বয়সী। ফাইভ কী সিক্সে পড়ে! সেই সময় এই বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। ডাকাতরা ডাকাতি করে চলে যাওয়ার পর ইব্রাহিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাহলে নিশ্চয় ডাকাতেরা তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে! কিংবা কোথাও কেটে-টেটে ফেলে দিয়েছে। এমন ভাবনা থেকে সেদিনও নিজের কপালে ঘামের উপস্থিতি টের পেয়েছিল পণ্ডিতসাহেব।

যদিও ইব্রাহিমের কিছু হয়নি। ডাকাতদের ভরে ইব্রাহিম কুঠিঘরে পাটের গাদিতে গিয়ে লুকিয়েছিল। এবং সেখানেই কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ির কাজের মেয়ে নাসিরা। নাসিরার তখন কী উল্লাস! চিৎকার করে বলেছিল, 'এই দ্যাখেন পণ্ডিতচাচা — আপনার বেটা কেমুন ঘুমিন আছে পাটের গাদিতে!' পণ্ডিতসাহেব এখন তেমনটাই আশা করছে। ঠিক নাসিরার মতো সেভাবেই কেউ লিটনের খবর এনে দেবে তাকে পণ্ডিতসাহেব অপেক্ষা করছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে, খেয়াল নেই। পণ্ডিতসাহেবের চোখ পড়ে আবার খবরের কাগজটার ওপর। ওই কাগজে ব্যবসায়ী পুত্রের অপহরণের সংবাদটা আছে। যে-ছেলেটি অপহৃত হয়েছে তার বয়স লিটনের মতোই। স্কুল থেকে ফেরার পথে কে বা কারা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাহলে কি তার লিটনকেও অমন...!

না! পণ্ডিতসাহেবের মন তা মানতে চাইছে না। কিন্তু যারা লিটনকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তাদের কী হল? তারা কেউ ফিরে আসছে না কেন? তারাও কি লিটনের মতো সব গায়েব হয়ে গেল নাকি?

পণ্ডিতসাহেব অধৈর্য হয়ে উঠল। উঠল বলতে, সত্যি সত্যি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তখনই তার সামনে এসে দাঁড়াল ঠোটকাট্টি। বলল, পণ্ডিতভাই - শুননু নাকি তুমার পোতা গায়েব হুই গেলছে? তা হামি তো অকে সাংঝের সুমায় দেখাছিনু। ডাক্তারের বাগানের দিকে! জানপরাণ লাগিন ছুটতে ছুটতে কতি যেনে যেছিল। হামি অকে কত ডাকনু, তা উ কুনুন সাড়াই দিলে না।

ডাক্তারের বাগানে? পণ্ডিতসাহেব আঁতকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, ছুটে কোথায় যাচ্ছিল? সঙ্গে কে ছিল আর? — সুথে অর কেহু ছিল না ভাই। উ একলাই ছিল। হামি তখুন সফর সেরি বাড়ি ফিরছিনু। তাকে হামি কত ডাকনু! তা উ হামাকে কুনু উত্তর করলে না!

ঠোটকাট্টি বলে যাচ্ছে। পণ্ডিতসাহেব আর কিছু শুনছে না। খালি ভাবছে ডাক্তারের বাগান সংলগ্ন গোরস্থানের ঘাসজমিটার কথা। ক'দিন আগে সে ওই ঘাসজমিটার গল্প করেছিল লিটনকে। একথা মনে পড়তেই

পণ্ডিতসাহেব নিজের বৈঠকবারান্দায় আর দাঁড়ায় না, দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। ঠোটকাট্টি তাকে জিজ্ঞেস করল, পণ্ডিতভাই তুমি আবার কুমেঠ যেছো জী? ও পণ্ডিতভাই!

পণ্ডিতসাহেব কোনও উত্তর করে না। ঠোটকাট্টিও কিছু বুঝতে পারে না। তার খালি মনে হয়, দ্যাশদুনিয়ার হল কী? কেউ তার কথার উত্তর করছে না কেন?

ডাক্তারের বাগান সংলগ্ন ঘাস-জমিটা দীর্ঘদিন পতিত পড়ে অছে। বেশ লম্বা লম্বা ঘাস। অনেকদিন পর জমিটাকে দেখছে পণ্ডিতসাহেব। ক'দিন আগে এই জমিটার গল্প করেছিল পোতা লিটনের সামনে। নিজের ছেলেবেলায় শোনা গল্প। পূর্ণিমা রাত্রে নাকি এই ঘাস-জমিতে পরির দল নাচতে নামে! কার মনগড়া গল্প কে জানে! যুগ যুগ ধরে মানুষ শুনে আসছে।

তবে আজ যে পূর্ণিমা, কথাটা একেবারে খেয়ালে ছিল না পণ্ডিতসাহেবের। ঠোটকাট্টি যখন এসে বলল যে, লিটনকে ডাক্তারের বাগানের দিকে যেতে দেখেছে, তখন খেয়াল হয়েছে। তারপর এক মুহূর্ত দেরি করেনি, সোজা ছুটে এসেছে। কিন্তু এই বিশাল ঘাসজমিতে লিটনকে খুঁজবে কোথায়?

না, লিটনকে খোঁজে না পণ্ডিতসহেব। যদিও গোটা ঘাসজমিটাই তার চোখে স্পষ্ট। আরও কী আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘাসজমিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বাস্তব দুনিয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে যার খোঁজে এসেছে তার কথাও। সে এক আশ্চর্য দুনিয়ায় প্রবেশ করছে। তার মনে হচ্ছে সত্যিই হয়ত এখনই আকাশ থেকে এই ঘাসজমিতে পরির দল নেমে আসবে। তার চোখের সামনে পরিরা সব নাচতে শুরু করবে মখমলের মতো এই ঘাসের বিছানায়।

পণ্ডিতসাহেব এবার আকাশের দিকে তাকায়। দেখে চাঁদ তার সর্বনাশা রূপ নিয়ে বিরাজ করছে আসমানে। নক্ষত্রদের কারও পাত্তা নেই। তাহলে মর্ত্যের মানুষের মতো তাদেরও কি পরিনাচ দেখা বারণ আছে? পণ্ডিতসাহেব ভাবছে। ওই আসমান থেকে পরির দল জ্যোৎস্নায় ভর করে ঘাসবনে নেমে আসবে নিশ্চয়! এমনই কথা লিটনকে বলেছিল সে। পরিদের পিঠে ছোটো ছোটো দু'টি করে ডানা আছে। সেই ডানা নাড়িয়ে পরিরা নাচবে মখমলের মতো এই ঘাসের বিছানায়। নাচবে সারারাত। তারপর, চাঁদ যখন একরাশ ক্লান্তি নিয়ে ঢলে পড়বে পশ্চিম দিগন্তে, পরির দল এই ঘাসবন ছেড়ে উড়ে যাবে আকাশে।

পণ্ডিতসাহেব কল্পনা করছে। কল্পনা করছে কী, বিশ্বাস করতে শুরু করেছে পর্যন্ত। না হলে, লিটনের খোঁজে এসে লিটনকে ভুলে নিজেকে হারিয়ে ঘাসবনে দাঁড়িয়ে পরিনাচ দেখার জন্যে অপেক্ষা করবে কেন? এখন তার কোনও দুঃশ্চিন্তা নেই, দুর্ভাবনা নেই। কোনও উদ্বেগও নেই। ঠিক যেন লিটনের মতো, কিংবা সে হয়ত নিজেই এখন একজন লিটন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

— x —

LALGOLA MAHESH NARAYAN ACADEMY
1914
ঐকতান
বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, শিক্ষক, ও শিক্ষাকর্মী

অরিন্দম কর্মকার (IX-A)

অনন্য পাল (VIII-C)

বিনিত সরকার (VIII-A)

প্রিতম হালদার (VI-D)

বিশাল দাস (V-B)

অনুষ্কা ঘোষ (XI)

আলোক বর্মা ভকত (VIII-A)

সৃঞ্জয় কর্মকার (VIII-A)

অঙ্কুশ দাস (V-A)

রুপম হালদার (VIII-A)

সায়ন হালদার (VI-C)

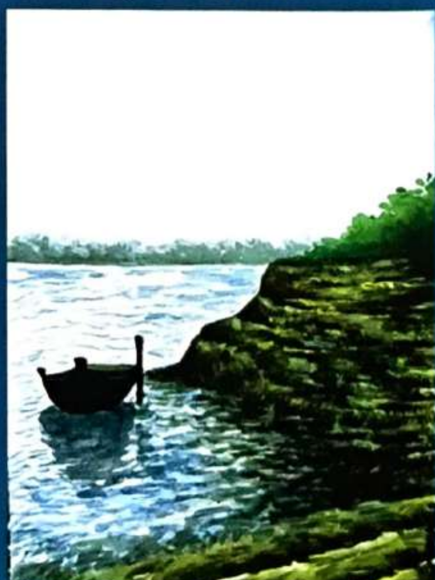

মুনিয়া বাঠিয়া (X-B)

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ সরকার (প্রাক্তন ছাত্র)

অবনীর বয়স এখন এগারো বছর। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। সে মাকে বলল, 'মা এখন তো স্কুলে যাব। তবে কোন পোশাক পরে যাব?' মা বললেন, 'কেন? রোজ যে পোশাক পরে যাস সেই পোশাক পরে যাবি।'

অবনী বলল, 'তুমি যে সেদিন বলেছিলে আগামী বুধবার আমার জন্মদিন। আজ তো বুধবার, গতকাল স্কুলের বন্ধুদেরও আমি বলেছি। আর গতকাল বাবা তো আমার জন্য নতুন পোশাক আনেননি। আর আমার স্কুলের বন্ধুরা বলেছে জন্মদিনে নতুন পোশাক পরতে হয়। এখন আমি যদি পুরাতন পোশাক পরে স্কুলে যায় তখন বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আমি কেন নতুন পোশাক পরে স্কুলে যাইনি?' তখন ওদের আমি কী উত্তর দেব?'

মা বললেন, 'তোর জন্য যে নতুন পোশাক কিনবো সেই টাকা কোথায় পাব? তুই তো দেখতে পাচ্ছিস কিছুদিন থেকে তোর বাবা অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে। কোনো আয় নেই। বাড়িতে যে চাল-আটা ছিল সেটা গতকালই শেষ হয়ে গেছে। পাশে তোর কাকুর বাড়ি থেকে এক কেজি আটা ধার করে এনে সকালে রুটি করেছি। এরপর তোদের ভাই-বোনেদের মুখে কী খেতে দেব সেটাই চিন্তা। তুই এখন বড়ো হয়েছিস, আমারে সংসারের কথা কিছুটা হলেও বুঝতে তো পারছিস। আর তোকে একটা কথা বলি বাবা শোন্। আমরা তো গরীব। গরীবদের জন্মদিন পালন হয় না।"

অবনী পুরাতন পোশাক পরে স্কুলে গেল। ক্লাসের কয়েকজন "হ্যাপি বার্থ ডে, অবনী। হ্যাপি বার্থ ডে।" বলে তাকে শুভকামনা জানাচ্ছে। ঠিক সেই সময় মাস্টারমশাই ওদের ক্লাস নেওয়ার জন্য ঢুকলেন। তখন ক্লাসের সবাই চুপ হয়ে গেল। মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমরা হ্যাপি বার্থ ডে বলে চিৎকার করছিলে। আজ কার জন্মদিন?'

একজন ছাত্র বলল, 'আজ অবনীর জন্মদিন স্যার। সেইজন্য ওকে আমরা শুভকামনা জানাচ্ছিলাম।'

পিছনের বেঞ্চে বসে থাকা অন্য একজন ছাত্র ধীর গলায় বলল, স্যার অবনীর জন্মদিন। কিন্তু অবনী পুরাতন পোশাক পরে এসেছে তো সেইজন্য বোঝা যাচ্ছে না যে ওর আজ জন্মদিন। মাস্টারমশাই বললেন, 'পরের কথাটা কে বলল?'

পিছনের বেঞ্চে বসে থাকা ছাত্রটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার, আমি বলেছি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ও কেন নতুন পোশাক পরে আসেনি সে কথা তুমি কি জানো?'

ছাত্রটি বলল, 'না স্যার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'না জেনে অন্যের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'অবনী, আজ কি তোমার জন্মদিন?

অবনী বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তুমি নতুন জামা-প্যান্ট পরোনি কেন?"

অবনী বলল, 'স্যার! আমরা তো গরীব। মা বলেছে গরীবদের জন্মদিন পালন হয় না। আর আমার নতুন জামা-প্যান্ট কেনা হয়নি। সেইজন্যই তো আমি পুরাতন পোশাক পরেই স্কুলে এসেছি।'

এরপর মাস্টারমশাই একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর ক্লাসের সব ছাত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজ স্কুল ছুটির পরে তোমরা সবাই ক্লাসে থাকবে। আমি তোমাদের একটি বিশেষ ক্লাস নেবো।'

মাস্টারমশাই পড়া শেষ করে ক্লাস থেকে বেড়িয়ে যাবার পরে, সব ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'আজ স্কুল ছুটির পরে স্যার কীসের ক্লাস নেবেন? যার জন্য স্কুল ছুটির পরে আমাদের সবাইকে ক্লাসে থাকতে বললেন?'

কিন্তু সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারলো না।

স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাজল। ঠিক সেইসময় মাস্টারমশাই একটি বড়ো চকোলেটের প্যাকেট, একটি মিষ্টির প্যাকেট আর একটি নতুন পোশাকের প্যাকেট নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। বললেন, 'আজ স্কুল ছুটির পরে আমি তোমাদের একটি বিশেষ ক্লাস নেবো বলেছিলাম না?

কয়েকজন ছাত্র এক সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সেই বিশেষ ক্লাসের বিষয়টি হল অবনীর জন্মদিন। এখন আমরা সবাই অবনীর জন্মদিন পালন করবো।'

মাস্টারমশাই অবনীকে ডেকে ওর হাতে একটি নতন পোশাকের প্যাকেট তুলে দেবেন, ঠিক সেইসময় একজন ছাত্র উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'স্যার! একটা কথা বলবো?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বলো।'

ছাত্রটি বলল, 'কেক না কাটলে কি জন্মদিন পালন হয়, স্যার?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আমি তো তাড়াহুড়োতে কেক আনতে ভুলেই গেছি। আর এই মুহূর্তে কেক পাবো কোথায়?'

একজন ছাত্র বলল, 'এই নিয়ে আপনি একদম চিন্তা করবেন না, স্যার। আমরা অবনীর জন্মদিনের জন্য কেক এনেই রেখেছি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমরা কেক কেনার পয়সা কোথায় পেলে?'

একজন ছাত্র বলল, 'স্যার, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আমাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেক কিনে এনেছি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সত্যি! তোমাদের বুদ্ধি ও মানসিকতার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। বড়ো হয়েও তোমরা এই মানসিকতাকে ধরে রাখবে।'

তারপর খুব আনন্দ সহকারে অবনীর জন্মদিনের কেক কাটা হল। মাস্টারমশাই অবনীর হাতে নতুন জামা-প্যান্ট আর একটি মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিলেন। সব ছাত্রদের মধ্যে চকোলেট বিতরণ করলেন।

অবনী মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে ও ক্লাসের বন্দুদের ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন জামা-প্যান্ট আর মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়িতে অবনীর মা তার হাতে নতুন জামা-প্যান্ট আর মিষ্টির প্যাকেট দেখে বলল, 'অবনী! তুই নতুন জামা-প্যান্ট আর মিষ্টি কিনতে টাকা কোথায় পেলি? নিশ্চয়ই তুই কোথাও চুরি করে সেই টাকা দিয়ে এগুলো

কিনেছিস। আমরা তোর জন্মদিনে তোকে নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দিতে পারিনি বলে তুই স্কুলের নাম করে চুরি করতে গিয়েছিস? তুই কার পাল্লায় পড়ে এই পথে নেমেছিস? আমাদের সংসারে এত অভাব থাকা সত্ত্বেও তোর বাবা কোনোদিন অসৎ পথে যায়নি। তোর বাবা বলে, 'অসৎ পথে অর্থ উপার্জন পাপ।' আর তুই কিনা এই অসৎ পথে নেমেছিস।' এই বলে অবনীর মা তাকে মারল।

অবনী কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মা, তুমি বিশ্বাস করো। আমি কোথাও চুরি করিনি। স্কুলের মাস্টারমশাই আর বন্ধুরা মিলে আমার জন্মদিন পালন করেছে। ওরাই আমাকে এই সব দিয়েছে।'

অসুস্থ বাবা বিছানায় শুয়ে করুণস্বরে বলে, 'একটা বাচ্চা ছেলেকে ওভাবে মেরো না। ও যখন বলছে স্কুলের মাস্টারমশাই আর বন্ধুরা সবাই মিলে ওকে এগুলো দিয়েছে, তবে ওর কথা ঠিকও তো হতে পারে। কেননা, অবনী আমার ছেলে। আমার ছেলে কখনো চুরি করতে পারে না।'

পাশের বাড়ির সুবীর অবনীর সঙ্গে পড়ে। অবনীর কান্না শুনে সে তাদের বাড়িতে ছুটে আসে। ছেলেটি বলল, 'কাকিমা, অবনী কাঁদছে কেন? অবনীর কি হয়েছে?'

অবনীর মা বলল, 'দেখোনা। অবনী স্কুলে যাবার নাম করে স্কুলে না গিয়ে কোথা থেকে টাকা নিয়ে নতুন জামা-প্যান্ট আর মিষ্টি কিনে এনেছে।'

ছেলেটি বলল, 'না-না! অবনী কোথাও থেকে টাকা আনেনি। ওতো সারাদিন আমাদের সঙ্গে স্কুলেই ছিল। আজ আমরা আমাদের ক্লাসের সবাই মিলে ওর জন্মদিন পালন করেছি। মাস্টারমশাই ওকে নতুন জামা-প্যান্ট আর মিষ্টি দিয়েছেন। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কেক কিনে ওর জন্মদিনের কেক কেটেছি। মাষ্টারমশাই আমাদের সবাইকে চকোলেট দিয়েছেন।'

এই কথা শুনে অবনীর মা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি না জেনে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই শুধু শুধু ছেলেটাকে চুরির অপবাদ দিলাম। ওকে শুধু শুধু অন্যায়ভাবে মারলাম।'

– x –

বিপদের কথা

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন ছাত্র)

আজ অনেকদিন পর হঠাৎ কেন জানি না বিপদের কথা মনে পড়ে গেল। বিপদের পুরো নাম বিপদভঞ্জন পাল। আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে উঠলাম, বিপদ তখন সেখানে অনেক আগে থেকেই জায়গা দখল করে বসে আছে। একগাল দাড়ি আর পুরুষ্টু গোঁফ নিয়ে বিপদ যথার্থ অর্থেই আমার কাকার বয়সী ছিল। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররাও একসময় বিপদের সহপাঠী ছিল। এসব নিয়ে বিপদের মনে কোনো গ্লানি ছিল না। বরং এক অদ্ভুত সাবলীলতায় ও সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারতো।

সপ্তম শ্রেণির প্রথম দিনেই মাস্টারমশাই বলে দিলেন - তোমরা কেউ বিপদের সঙ্গে মিশবে না, মিশলে তোমাদের জীবনেই বিপদ নেমে আসবে। বিপদ পেছনের বেঞ্চে বসে এই কথা নির্বিকার হয়ে শুনেছিল। আমাদের কিশোর মনে একই সঙ্গে আশঙ্কা আর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ বিপদ আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। বিপদ আমাদের কাছে এক নিষিদ্ধ জগতের দরজা খুলে দিল। এর আগে খেজুর রসের আস্বাদনে মন খুশি হতো। বিপদের হাত ধরে আমাদের সঙ্গে আদিরসের পরিচয় হলো। জীবনবিজ্ঞানের যে অধ্যায়গুলো লেখক এবং মাস্টারমশাই অত্যন্ত রক্ষণশীলভাবে পড়াতেন, বিপদ সেগুলো তার বাস্তবজ্ঞান নিয়ে আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিত। বাকি সব পড়াশোনায় বিপদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। ক্লাসের বেঞ্চ দখল করে বসে থাকাই ছিল ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

বিপদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম আমরা অর্থাৎ ওর সহপাঠীরা। আমাদের অভিভাবক হয়ে বিপদ আমাদের রক্ষা করতো। উঁচু ক্লাসের কোনো দাদা আমাদের কাউকে মারধোর করলে বিপদের হাত থেকে তার রক্ষা ছিল না। ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় আমাদের কোনোভাবে ঠকানো হলে বিপদ খেলা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত। ফলে অন্যপক্ষ বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতো। আমি ক্লাসে প্রথম হতাম বলে বিপদের বিশেষ ভালোবাসা ছিল আমার প্রতি। প্রায়ই আমার জন্যে কাঁচামিঠে আম, টোপো কুল, জাম, পেয়ারা, কয়েতবেল, হজমিগুলি ইত্যাদি পকেটে করে নিয়ে আসতো। আমার বসার জায়গা নিয়ে কেউ গন্ডগোল করলে বিপদ তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করে দিত। এমনকি একবার একটা কাঠবেড়ালির বাচ্চা ধরে এনে আমাকে পুষতে দিতেও চেয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও মা-বাবার শাসনের ভয়ে তা আর আমার নেওয়া হয়নি। বিপদ আমাকে শিখিয়েছিল - কী করে ছাতা খুলে উল্টো করে ধরে গাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলা কয়েতবেল ধরতে হয়।

কালের নিয়মে আমরা উঁচু ক্লাসে উঠেছি এবং এই নিয়ম অগ্রাহ্য করে বিপদ নীচের ক্লাসেই থেকে গেছে। কিন্তু আমার প্রতি ওর ভালোবাসা কখনোই একটুও কমেনি। তারপর হঠাৎ একদিন বিপদ স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। কী করে যেন খবর পেলাম - ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। হোস্টেল থেকে বাড়ি এসে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে গেছি। গিয়ে দেখি টিকিট কাউন্টার বন্ধ আর প্রায় দ্বিগুণ দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। নিরাশ হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ ঘাড়ের কাছে একটি হাতের স্পর্শ এবং আনন্দের ডাক - আরে, অনির্বাণ না! কেমন আছিস? চমকে ঘুরে দেখি আমার সেই সহপাঠী বিপদ। চেহারা

কেমন ভেঙে পড়েছে, বয়সের তুলনায় আরো বয়স্ক লাগছে। ও টিকিট ব্ল্যাক করছে। আমি সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাচ্ছি শুনেই আমার হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিল। অনেক জোরাজুরি করা সত্ত্বেও কিছুতেই দাম নিল না। বারবার শুধু একটা কথাই বলে গেল — তুই পড়াশোনায় কত ভালো, কত ভালো ছেলে। তুই তো আমার বন্ধু।

সেদিন হঠাৎ উপলব্ধি হয়েছিল — কী এক ভীষণ ভুল শিক্ষায় আমরা বড়ো হয়েছি। যার মন এত বড়ো, এত উদার - সে তো কিছুতেই বিপদ হতে পারে না। শুধুমাত্র পড়াশোনার মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে আমরাই সমাজের বিপদ ডেকে আনছি না তো! সেদিন প্রথমবার আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম - বিপদভঞ্জন, তুই ভালো থাকিস। বন্ধু হিসেবে তোকে চিরকাল মনে রাখবো।

“দলদলির দিন গলাগলির দিন
হঠাৎ অকারণে হেসে ওঠার দিন
বন্ধু, কী খবর বল?
কত দিন দেখা হয়নি ...”

— x —

শেষ কবরের পাশে

মোঃ জিয়াউর রহমান (সহকারী শিক্ষক)

বড়ো গোরস্তানটা পার করার সময় রুমেলার কবরটার দিকে ভয়ে তাকায়নি সাবির। কিংবা হয়তো তাকিয়ে ছিল। কিছু মনে নেই। রুমেলা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। রাতারাতি পরিবারের লোকে মিলে তাকে কবর দিয়ে দেয়। ওদের গ্রামের প্রান্তে ঘন বাঁশ বাগানটা পার হয়ে এই গোরস্থান। সারি সারি কবর, রুমেলারটা একদম রাস্তার পাশে। ওটাই এই সারির শেষ কবর।

ছোটো ভাই খাবিরের হাত ধরে ছুটছিল সে যাতে রুমেলার কবরটা দ্রুত পার হতে পারে। উপরপাড়ার মাঠে আজিজ মোড়লের বাগানের পরে তাদের গমের জমি যাওয়ার এই একমাত্র সরু আলপথ। জাকাত মেম্বারের শ্যালো মেশিন থেকে ঘন্টা হিসাবে গমের জমিতে সেচ দেওয়া হবে। শীতের শুকনো মাটিতে সব জায়গায় জল পৌঁছায় না বলে জল ছেঁচে দিতে হবে। তাই গামলা হাতে দুই ভাই সকাল-সকাল বেরিয়েছে।

সেদিনের সকালটা ছিল ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া। দশ হাত দুরের জিনিসও দেখা যায় না। না তাকালেও সাবির অনুভব করে রুমেলার কবরের মাটিগুলো কেমন যেন এলোমেলো — ছড়ানো ছিটানো। কিছুটা তো আলের উপরে চলে এসেছে। হয়তো শেয়াল হাঁচড়েছে। ক'দিনই বা হবে! মাস তিনেক! মাটি সরে গিয়ে কবরের বাঁশ দেখা যাচ্ছিল। ভয়ে সাবির চোখ বন্ধ করে। খাবিরের হাত ধরে প্রাণপণে ছুট লাগিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কবরের কাছে এসে কে যেন টান মেরে খাবিরের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। সাবিরের ভিতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে। তাহলে কি সেই রাতের জ্বীনটা সত্যি ছিল! না হলে ঠিক রুমেলার কবরের কাছেই খাবিরের হাত ফস্কে গেল কেন? পিছন দিকে না তাকিয়ে সাবির প্রাণপনে ছুটতে থাকে, একা।

কুয়াশার চাদর ফেড়ে সাবির কতটা পথ চলে এসেছে তার খেয়াল নেই! গমের জমির পাশে বাগানে এসে সাবিরের সম্বিত ফেরে। ভায়ের নাম ধরে চিৎকার করতে থাকে সে। হয়তো আশা করেছিল খাবির ওর পিছু পিছু ছুটে চলে আসবে। কিন্তু কুয়াশার ভিতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। নিজের ভাইকে তার সন্দেহ হয়। তাহলে তার ভাই-ই কি সেদিন জ্বীন বা শয়তান এর রূপ ধরে তাদের পিছু নিয়েছিল?

জ্বীন বা শয়তান সম্পর্কে মৌলবি সাহেবের ওয়াজ শুনে তার একটা ধারনা হয়েছিল। শয়তানরা বদমাশ হয়, মানুষকে কুপথে ঠেলে দেয়। মানুষের যা কিছু খারাপ কাজ সে সবই নাকি শয়তানের কারসাজি। তাদের পাড়ার খুইদ্যার বউকে যেদিন সকালে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছিল সেদিনও সবাই বলাবলি করছিল, "খুইদ্যার বহুর ঘরে রাইতে শয়তান ঢুইক্যা ছিল।"

খুব সুন্দর ছিল খুইদ্যার বউটা। ফর্সা গোলগাল চেহারা। সবসময় হাসি খুশী। চওড়া কপালের উপর চুলগুলো ছেঁড়া পানপাতার মতো গোল করে সাজানো থাকত। সীতা থেকে ঝুলতো "মান টিকলি"। লাল রংয়ের ছাপা সুতির শাড়ির নীচ থেকে সায়ার ঝলর বেরিয়ে থাকতো। হাঁটার সময় তার পায়ের নুপুরের রিনিঝিনি আজও যেন সে শুনতে পায়। মেয়েটিকে বেশ ভালোই লাগতো সাবিরের। বয়স্করা বলত, "ভাতার কামে গেছে আর মাগি পাড়া পাড়া ঠশক দ্যাখিয়া ব্যাড়াইছে।"

মাসখানেক পরে খুইদ্যা বিদ্যাশে "রাজমিস্ত্রীর কাম" থেকে ফিরে এসে বউয়ের মরার খবর শুনে প্রায়

পাগলের মত হয়ে গেছিল। একটা রেডিওর আবদার করেছিল রুমেলা। সেটাকে বুকে জড়িয়ে খুইদ্যার কি কান্না! অনেকেই চোখের জল মুছে ছিল। মৌলবি সাহেব খুইদ্যাকে বুঝাচ্ছিলেন, "খুদু ভাই, এ সবই হল শয়তানের কারসাজি। শয়তানের খপ্পরে পড়ে মেয়েটা অকালে চলে গেল। সবুর কর। "*ইন্নাল্লাহা মা আস সবেরিন* — নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।" আরও অনেক কথা বলেছিলেন মৌলবি সাহেব। সবটা সাবিরের মনে নেই।

সেই রুমেলার কবরের পাশ দিয়ে আজ আসার সময় কুয়াশার গাঢ় আঁধারে খাবিরের হাত ছুটে যায়। মাঘ মাসের কুয়াশা ঘেরা সকালের এই ঠান্ডাতেও সাবির টের পায় তার কানের পেছন দিয়ে ঘামের উষ্ণ ধারা নীচে নামছে। আর মেরুদন্ডে বইছে শীতল স্রোত।

রুমেলার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেরুদণ্ডে এমন শীতল স্রোত এর আগেও একবার বয়েছিল সাবিরের। সেদিন কিন্তু এত ঠান্ডা ছিল না। পুজোর ছুটির পরে তখন সবে স্কুল খুলেছে। গঞ্জের বড়ো স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুল থেকে ফিরতেই মা বলেছিল, "ব্যাটা, তোমার ঘি-নানী আজ মারা গেছে। চল তো ব্যাটা, দেইখ্যা আসি। চিক্যাস ডুবার আগে চইল্যা আসবো।"

- খাবিরকে লিয়্যা যাও। হামি এখন যাব না, ব্যাট-বল খেলতে যাব।

- না ব্যাটা, উ লাছ-এ খেলছে। ওকে লিব না, মরার বাড়িতে যায়্যা উ বিরক্ত করবে। তুই আর হামি লক্কাইর‍্যা যাব আর দেইখ্যা চইলা আসবো।

- কিন্তু যদি উ তোমাকে ঢুঁড়ে?

- তোর দাদিকে বুইল্যাছি। তাকে দেইখ্যা থুইবে। তার আগেই তোর বাপজান চইল্যা আসবে।

খাবিরটা সত্যি খুব চঞ্চল। শুধু তাই নয়, যেমন দুষ্টু তেমনই শয়তান। ওর থেকে তিন বছরের ছোটো। সাবিরের মা কাউকে "শয়তান" বলাতে আপত্তি করে। রুমেলা মারা যাওয়ার পর শয়তান সম্পর্কে একটু ধারণা হয়েছে সাবিরের। শয়তানরা মানুষও খুন করতে পারে! খাবির শয়তান নয়, তাহলে ও কি? তাহলে কি ও কোনো জ্বীন?

মায়ের ছোটো ফুফু, আসল নাম কালোসোনা বেওয়া। চকচকে কৃষ্ণবর্ণা, সেই জন্যই নাকি এমন নাম। ওরা ডাকতো ঘি-নানি। ওদের গ্রামের শেষে বাঁশবাগান তার পর ঐ বড়ো গোরস্তান। সেটা পার করে তেঁতুলে পাড়ায় ওর বাড়ি। তেঁতুলে পাড়ার ওপারে উত্তর দিকে একটা বড়ো আমবাগান, শিকারীবাগান। বাগানের শেষেই হল শিমুলতলির মাঠে। লোকে বলে উপরপাড়ার মাঠ। মাঠের ঠিক মুখে বাগানের পাশেই ওদের গমের জমি।

গ্রাম্য ভাষায় ঘিণানী বলতে নাক উঁচু বুঝালেও কুচকুচে কালো অভিজাত পরিবারের মেয়ে এই কালোসোনা নানি ছিলেন খুব পরিচ্ছন্ন ও দিলদরিয়া মানুষ। ঘি-নানীর একছেলে হাইরোডের মোড়ে চায়ের দোকান দিয়েছে। বেশ ভালই চলে। প্রতিদিন প্রায় তিরিশ কেজি দুধ কাটে। দোকানের দুধের সর থেকে অনেক ঘি তৈরি হয়। এই নানী একবার সাবিরদের সরিষার তেলের বদলে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের আঁধাশা করে খাইয়ে ছিলেন। ঘি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল। সাবিরেরা সেই থেকে কালোসোনা নানিকে ঘি-নানী বলে ডাকত। তাদের নিজেদের বাড়িতে অবশ্য সর্ষের তেল অথবা ডালডা দিয়ে আঁধাশা করে। গাওয়া ঘিয়ের আঁধাশা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

মাঝেমধ্যে হরলিক্সের বয়াম ভর্তি ঘি পাঠাতো নানি। সাবিরের বাপ পয়সা দিতে চাইলে তিনি নিতেন

না। বলতেন, "হামার তো ঘরের জিনিস, দাম লিব কি? দিনু, নানীর দেওয়া ঘি খাইলে হাঁর লাতির্ঘে বেরেন ভালো হইবে, লেখাপড়া শিখ্যা বড়ো হইবে।"

সেই নানী এদিন মারা গেছেন।

সাবিরেরা যখন মরাবাড়ি পৌছায় ততক্ষণে কাফন পরিয়ে লাশ খাটে নিয়ে গোরস্থানের দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম। সন্ধ্যের আগেই দাফন ক্রিয়া শেষ করতে হবে। নানীর মুখের কাফন একটুকু সরিয়ে ফুপুর মুখখানা শেষবারের জন্য দেখান হয় সাবিরের মাকে। সাবিরের মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। একজন মহিলা তাঁকে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। উঁচু মাটির দাওয়ায় খেজুর পাতার পাটিতে বসায়। যেখানে আগে থেকেই অনেক মহিলা বসে একসাথে ঝুঁকে ঝুঁকে সুর করে কাঁদছিলেন। কাউকেই সাবির খুব একটা চেনে না। মাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা কান্না জুড়ে দেয় নানির একমাত্র মেয়ে সাবিরের রহিমা খালা। উঃ! এমন কান্না সাবির কোনোদিন দেখেনি। তার কেমন অস্বস্তি লাগে। পুরুষরা জানাজার উদ্দেশ্যে আগেই বেরিয়ে গেছে। বড়ো একা লাগে সাবিরের। সে একটু দূরে গিয়ে একটা খালি চৌকিতে বসে। ফুফুর জন্য তার মায়ের এই বুকফাটা কান্না দেখে সাবির একটু অবাক হয়। কিছুক্ষণ পর কান্নার রেশ কমে। তার পরে চলে তাদের স্মৃতিচারণ। পারস্পরিক কথাবার্তা ও থেকে থেকে এক-এক জনের সুর করে কান্না। বাকিরা তখন তাকে সমবেদনা জানিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে। এরকম শোকের পরিবেশ এর আগে নিবিড় ভাবে কোনোদিন দেখেনি সাবির। এমনটা কতক্ষণ চলে সাবিরের খেয়াল থাকে না।

ইতিমধ্যে মাগরিবের আজান হয়। ওজু করে ওদের সাথে এক কাতারে নামাজ পড়ে সাবিরের মা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে সাবির উসখুস করে। অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময় আসে। বেরোনোর আগে সাবিরের মা আধাআধি ভাঙা এক গোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে নেয়। আর সাবিরকে এক আঁটি পাটকাঠি দেয়। সেই পাটকাঠি বগলে নিয়ে সাবির তার মায়ের হাত ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ পরেই তারা বড়ো গোরস্তানটার কাছে চলে আসে। ডানহাতে ধরা পাটকাঠিগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তাতে সামনে অনেকটা পথ আলোকিত। সাবির কোনো দিকে তাকাতে পারে না। সে মাথা নীচু করে মায়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে থাকে। বেশ দ্রুত হাঁটছিল ওরা। কিন্তু আড়েবহরে বড়ো গোরস্তানটা যেন শেষ হতে চায় না। একেবারে রাস্তার পাশে রুমেলার কবরের পাশে আসতেই তার হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে সাবিরের মা। মাত্র কয়েক দিনের পুরোনো রুমেলার কবর। কবরের উদ্বৃত্ত মাটিগুলো পায়ে হাঁটা পথের উপর আলগোছে পড়ে আছে। মায়ের হাতের চাপে সাবির সজাগ হয়ে ওঠে। পায়ের চাপে শুকনোকাঠি ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পায়। টের পাই ওদের কেউ যেন অনুসরণ করছে। হিংস্র নিশাচর জন্তু-জানোয়ার বা অন্ধকারের অজানা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই হাতের এই জ্বলন্ত আগুন।

- তবে কি শিয়াল?

গোরস্থানে শিয়ালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নতুন কবরের উপর খেজুর বা কুলের কাঁটা দেওয়া হয়। তবুও সব সময় রক্ষা পায় না। ভয়ে ভয়ে ও বাঁদিক দিয়ে পিছন ফিরে এক ঝলক তাকায়। আগুনের উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পায় শিয়াল নয়, একটি কুচকুচে কালো মানব শিশু। শিশু ঠিক নয়, বালক। খালি গা খালি পা। মাথায় হালকা চুল। পরনে পাটা কাপড়ের ডোরাকাটা ঢোলা হাফ প্যান্ট। হাফ পাজামাও বলা যেতে পারে। মুখটি অস্পষ্ট হলেও কালো মুখে চকচকে সাদা দুটি চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলছে। সাবির মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রুমেলার কবরের উদবৃত্ত মাটিতে মনে হচ্ছে ওর পা বসে যাচ্ছে। মায়ের হাতটি শক্ত করে ধরে। কোনো কথা বলে না।

হঠাৎ ওর মা হাতের জ্বলন্ত আগুনটাকে পিছনের দিকে দ্রুত নাড়াতে থাকে। বাতাসে আগুনের সোঁ-সোঁ শব্দটা আরও তীব্র হয়। তার চেয়েও তীব্রতর হয় ওই আগুনের শিখা। দাও দাও করে হাতের আগুনটি লেলিহান শিখায় জ্বলতে থাকে।

- হ্যাট, হ্যাট। যাহ্! যাহ্! *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানের রাজিম।* ইয়া আল্লাহ তুমি শয়তান থেকে রক্ষা করো। *লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ জলিমীন।*

দোয়া পড়তে পড়তে সাবিরের মা দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। সাবির এক ঝলক পিছন ফিরে দেখে। ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর মনে কু ডাকে। তাহলে কি রুমেলা কবর থেকে উঠে শয়তান বা জ্বীন হয়ে ওদের পিছু নিয়েছে? বাচ্চা ছেলের রূপ ধারণ করে? এই কি তবে শয়তানের প্রতিমূর্তি?

শয়তান বা জ্বীন কি রকম হয় তা সাবির জানে না। কোনাদিন চোখে দেখেনি। তবে অনেক কথা শুনেছে। তার মায়ের কাছে একবার তার নানার জ্বীন দেখার গল্প শুনেছিল। সাবিরের নানা যৌবনকালে গরমের সময় একদিন পুকুর পাড়ে নিম গাছের নীচে মাচানে শুয়ে পুকুরের মাছ পাহারা দিচ্ছিল। গভীর রাত্রে মাচানের উপর দমাদ্দম লাঠির আঘাতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পান, ছোটোছোটো একপাল মানুষ পিলপিল করে পুকুরের জল থেকে উঠে আসছে। তাদের আধ হাত লম্বা শরীর সাদা কাপড়ে মোড়া। মাথায় সাদা টুপি। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাঁশের লাঠি। সেই লাঠির শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপরে তারা সবাই মিলে তার নানাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হুকুম দিয়েছিল, এই উঠ্। চল্ উজু কর্। উজু করে মসজিদে চল্। নামাজ পড়্!

সেই রাত্রে সাবিরের নানা পুকুরের জলে ওজু করে এসে নাকি সারারাত ধরে নামাজ পড়েছিল। সকাল বেলায় তাকে উপুড় হয়ে সিজদারত অবস্থায় পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার করা হয়। তার সারা শরীরে ছিল লাঠির আঘাতের কালশিটে দাগ। জ্ঞান ফিরলে তিনি রাতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। বড়ো পীর সাহেব খবর পেয়ে এসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন তিনি খুব ভাগ্যবান। সেই রাতে তিনি ভালো জ্বীন-এর খপ্পরে পড়েছিল। সেগুলো ছিল মোমিন জ্বীন। এরা আল্লার খিদমত করে, এবাদত করে। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। পীরসাহেবের পরামর্শে সেদিন থেকে সাবিরের নানা পঞ্জেগনি নামাজী হন এবং খুব অল্পবয়সেই হজ্জ্ব করে হাজী হন। লোকশ্রুতি আছে সাবিরের নানা নাকি জ্বীন বশীকরণ করতে পারতেন। ওঁদের জন্যই নাকি তার যত উন্নতি।

পিছনের এই ছায়ামূর্তি কি তবে রুমেলার জ্বীন? তবে এই রূপে কেন? সে তো অন্য কোনো মূর্তি নিতে পারতো! পোশাক পরিহিতা সুন্দরী নারী মূর্তি! রুমেলা কত সুন্দরী ছিল!

যদিও নারী-জ্বীনের কথা সাবির কোনোদিন শোনেনি। তবু নিদেন পক্ষে এই জ্বীনটি তার নানার দেখা জ্বীনগুলোর মতোও তো হতে পারতো! সাদা পোশাক - মাথায় টুপি — একদম ঠিক মুমিন জ্বীনগুলোর মত! এ কেমন আদুল গায়ের অর্ধ-উলঙ্গ জ্বীন! আর তার মা যে কেন তার নানার কাছ থেকে জ্বীন বশীকরণ বিদ্যাটা শিখে নেয়নি। তাহলে আজ জ্বীন দেখে তাকে ভয় পেতে হতো না। সাবির ভাবতে থাকে। অবশ্য সবই নাকি আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ কখন যে কাকে কোন এলেম দেন তা কে জানে!

কিছুক্ষণ পর আবার টের পায় ছায়ামূর্তিটি ছুটে এসে আবার তাদের পিছু নিয়েছে। ততক্ষণে অবশ্য তারা

রুমেলার কবরটি ছেড়ে বাঁশবাগানের গভীর অন্ধকারে প্রবেশের মুখে। কিন্তু এখনও অনেকটা পথ বাকি। হাতের আগুনটাতে আরও কিছু নতুন পাটকাঠি গুঁজে নেয় সাবিরের মা। বাঁশবাগানটা শেষ হলে তাদের কানাপুকুর, তারপরেই ওদের বাড়ি।

সাবিরের মা এবার একটু সাহস করে বলে ওঠে, — এই ছুঁড়া তোর নাম কি রে?

- খাবির।

- আঁ? চমকে ওঠে সাবিরের মা। এ যে তারই ছোটো ছেলের নাম?

- তোর বাপের নাম কিরে?

- তামিজুদ্দিন। বিস্মিত হয় সাবির। এ তো তার বাপের নাম!

- তোর দাদোর নাম কিরে?

- আব্বাস বিশ্বাস।

সাবিরের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। তার নিজের দাদোর নাম! সাবির ওর মায়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। মায়ের শরীরের শিহরণ অনুভব করে।

সাবিরের মা মনে মনে ভাবতে থাকে তাহলে কি তার খাবির অন্ধকারে তাদের খোঁজে চলে এসেছিল! কখন এল! এতক্ষণ দেখেনি কেন? কিন্তু এ ছেলেটি তো ছোটো! তাছাড়া খালি গায়ে! কণ্ঠটিও তো কেমন অচেনা!

পাটকাঠির আগুনের আলোয় ওর মুখটা ভালো করে দেখা যায়নি। শুধু অন্ধকারে ওর জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখেছিল। ছেলেটিকে কি আর একবার ঘুরে দেখবে? সাহস পাচ্ছিল না। পিছন দিকে না ফিরে সাবিরের মা বলে, এ ছুঁড়া এত রাইতে কুণ্ঠে যাবি রে?

পিছন থেকে উত্তর আসে, মহজিদ।

তাদের গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে এশা'র আজানের ধ্বনি ভেসে আসে।

সাবিরের মা দোয়া পড়তে থাকে — *লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ জলিমিন।* হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বুকে তিনবার ফুঁ দেয়। ততক্ষণে রাস্তাটি বাম দিকে বাঁশ বাগানের ভিতর চলে এসেছে। বাগান পার হলেই পুকুর। তার ওপারে তাদের বাড়ি। ছেলেটি কি ওদের পিছুপিছু বাড়ি পর্যন্ত যাবে? সাবিরের মা পুকুরপাড়ে এসে এবার সাহস করে পিছনে ফিরে দেখে।

কিন্তু নাহ! কেউ কোথাও নেই!

সাবিরের মায়ের বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। তাহলে কি আজ ও জ্বীন দেখল? তার বাপও তো একবার দেখেছিল! তবে এ কেমন জ্বীন! রুমেলার কবর থেকে উঠে আসা! আবার মসজিদে যাচ্ছে!

প্রায় ছুটতে থাকে সাবিরের মা। বাড়ি প্রবেশের আগে হাতের জ্বলন্ত পাটকাঠি গুলো পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাবিরের মা জানে আল্লাতালা যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমন জ্বীন নামক *মাখলুকাত*-ও সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তৈরি করেছেন মাটি দিয়ে আর জ্বীন তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে। নিজের হাতের আগুনকে তার ভয় হয়।

বাড়িতে প্রবেশ করে সাবিরের মায়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তার ছোটো দূরন্ত চঞ্চল খাবির শান্তশিষ্ট হয়ে বাপের পাশে হারিকেনের আলোয় বই নিয়ে পড়ছে। দেরির কারণ জানতে চেয়ে ওর বাপ কিছু বলার আগেই সাবিরের মা খাবিরকে জিজ্ঞেস করে, তুই এতক্ষণ কুণ্ঠে ছিলি? তুই কি বাহিরে গেছিলি? ওর বাপকেও জিজ্ঞাসা করে। দুজনেই তার মায়ের প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়। সাবিরের মা দ্রুত সমস্ত ঘটনা বলে। নিজের

ভাইয়ের প্রতি সাবিরের সন্দেহ হয়। ও যা শয়তান! নাকি ও শয়তান নয়, জ্বীন?

সমস্ত কিছু নিশ্চিত হয়ে সাবিরের মা খাবিরকে বুকে চেপে ধরে। চুমু খায়। খাবির ফ্যালফ্যাল করে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো ও ভয় পেয়েছে। ওর বাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জ্বীনের কথা কোরআন-হাদিসে পড়েছে, জেনেছে। ওয়াজ নসিহতেও শুনেছে কিন্তু চোখে দেখেনি কোনোদিন। ভেবেছিল হয়ত কোনোদিন আর দেখা হবে না। ওর বাপ বলত জ্বীনদের এখন এই দুনিয়াতে দেখা যায় না। মানুষের *নাফারমানি* দেখে ওরা আসমানে উঠে গেছে। অথচ সেদিন সাবিরের মা জমিনে জ্বীন দেখেছে। সাবিরও দেখেছে, তবে অন্ধকারে ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারেনি। গমের জমির পাশে বাগানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ভাইয়ের নাম ধরে ডাকতে থাকে সাবির। অবশেষে খাবির আসে। সঙ্গে আরো দুই তিন জন। ওরই বয়সি বা ওর চেয়ে একটু বড়ো. সাবির ওর ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, এতখুন কুণ্ঠে ছিলি?

ভাই উত্তর দেয়, হামি উষ্টা খ্যায়া পড়্যা গেছুনু। আর তুই তো হামাকে ফেইল্যা ছুইট্যা পালিয়্যা আলি! হামি অরঘে সুনে সুনে আইনু। আসতে আসতে আম কুড়াছিনু। দ্যাখ কত আম পায়্যাছি! বলে পকেট থেকে ছোটো ছোটো সবুজ মটরদানার মতো কতগুলো কলিআম বের করে দেখায় খাবির।

খাবির বলে, বড়ভাই জানিস? এই ছুঁড়ার নামও খাবির! বলে একটি ছেলের দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

সাবিরের চমক লাগে। সে জিজ্ঞেস করে, ওই তোর বাপের নাম কিরে?

ছেলেটা বলে, তমিজ।

- আর তোর দাদোর নাম?

উত্তর আসে, আব্বাস।

সাবির বিরক্ত হয়। বলে, হট শালা! মারব এক থাপ্পড়! তাই হয় নাকি বে? তোর নাম — তোর বাপের নাম — তোর দাদোর নাম — সবই মিল? পাশের আরেকটি ছেলে বলে ওঠে, হ্যাঁ জি! তাই।

সাবিরের মাথায় চমক খেলে যায়। এই ছুঁড়া তাহিলে তুই-ই সেদিন রাইতে হাঁরঘে সুনে যাছিলি নাকি বে?

- হ্যাঁ, যাইছুনু তো! কিন্তু তোমার মা হামাকে তো আর একটুকের লাইগ্যা আগুন দিয়্যা পুড়িয়্যা দিছিল!

- কুণ্ঠে যাছিলি বে অত রাইতে? একলাই?

ছেলেটি বলে, নামোপাড়ার মহজিদে জালসা শুনতে। হামি যাইতে চাহ্যাছিনু কিন্তু হামার বড়ো ভাই হামাকে লিয়্যা যায়নি। তাই তোমরাকে দেইখ্যা তোমারঘে পিছে পিছে যাছিনু। আর তোমার মা তখুন এমুন কইরা আগুন দ্যাখাছিল। আরেকটুকের লাইগ্যা হামি তো পুইড়্যা জাইতুং।

- তাহিলে তুই একটু পরে আবার কুণ্ঠে হারিয়্যা গেছিলি বে?

- তোমরা বাঁশড়ার দিকে ঘুইর্যা গেইল্যা আর হামি ফায়কেরঘে কান্টা দিয়্যা মহজিদের দিকে দোড়িয়্যা চইল্যা গেনু।

সাবিরের মাথায় চমক খেলে যায়। সে ছেলেটির গালে "শালা" বলে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। তারপরে বাড়ির দিকে ছুট লাগায়। একা একা। রুমেলার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে গতি কমিয়ে দেয়। ততক্ষণে কুয়াশার চাদর সরে গিয়ে সূর্যের হলুদ আলো উঁকি দিয়েছে রুমেলার কবরে উপরে।

— x —

এক টুকরো ক্ষীণ আলো এবং একটি বুলডোজারের গল্প

ইমতিয়াজ আহমেদ (সহকারী শিক্ষক)

আজ খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিনের জমে থাকা কালো মেঘগুলো যেন সন্ধ্যার পর হঠাৎ করে নিজেদের সমস্ত অভিমান উজাড় করে দিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে, তারপর আবার চারপাশ অন্ধকার। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ব্যালকনির রেলিংয়ে এসে আছড়ে পড়ছে। দূরের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেছে বৃষ্টির পর্দায়। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। বৃষ্টি দেখতে আমার বরাবরই ভালো লাগে। বৃষ্টির মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে। শহরের কোলাহল যেন কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। গাড়ির শব্দ, মানুষের হাঁটাহাঁটি, চারপাশের ব্যস্ততা - সবকিছু মুছে গিয়ে শুধু বৃষ্টির শব্দটুকু থেকে যায়। কিন্তু আজ এই বৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়েও বারবার চোখ আটকে যাচ্ছে নীচের দিকে। নীচে এখন একটা ফাঁকা জায়গা। কিছুদিন আগেও সেখানে একটা বস্তি ছিল। ছোটো ছোটো ঘর। টিনের চাল। বাঁশের বেড়া। কোথাও পলিথিন টাঙানো। কোথাও পুরোনো কাপড় দিয়ে বানানো পর্দা। ঘরগুলো হয়তো খুব সুন্দর ছিল না, কিন্তু সেগুলোতে মানুষ ছিল। জীবন ছিল। সংসার ছিল। হাসি ছিল। কান্না ছিল। অভাব ছিল। স্বপ্ন ছিল। ছিল মানুষের অস্তিত্ব। আজ সেখানে কিছুই নেই। শুধু একটা বিশাল শূন্যতা। বৃষ্টির মধ্যে সেই শূন্য জায়গাটাকে আজ আরও বেশি অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক অদৃশ্য হাত যেন জায়গাটার বুক থেকে একটা আস্ত জীবন উপড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চার্য - এই সমস্ত শূন্যতার মধ্যেও কোথাও একটা ক্ষীণ আলো এখনও জ্বলছে। খুব ছোট্ট একটা আলো। বৃষ্টির ঝাপটায় কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই হয়তো আলোটা নিভে যাবে। তবু যতক্ষণ জ্বলছে, ততক্ষণ মনে হচ্ছে - বস্তিটা এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। এই সামান্য আলোটুকুই যেন তার অস্তিত্বের শেষ সাক্ষী। আমি জানি না, আলোটা কার। হয়তো কোনো ঘরের শেষ সম্বল। হয়তো কোনো মানুষ এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কেউ ফিরে আসবে বলে একটা বাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। হয়তো কোনো ঘর ভেঙে যাওয়ার পরও তার বিদ্যুতের সংযোগটা এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু আজ আমার কাছে এই আলোটা শুধু একটা আলো নয়; এই আলো যেন পাঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটা ইতিহাস। হয়তো তারও বেশি। কতগুলো বছর ধরে সেখানে মানুষগুলো বসবাস করেছেন - তার হিসাব হয়তো কোনো সরকারি কাগজে নেই। কোনো নথিতে লেখা নেই তাদের প্রতিটি দিনের গল্প। অথচ প্রতিটি ঘরের দেয়ালে, প্রতিটি টিনের চালে, প্রতিটি সরু গলিতে কত মানুষের জীবন জমা ছিল। সেখানে হয়তো কোনো শিশু জন্মেছিল। সেই শিশুটি হয়তো সেখানেই প্রথম কান্না করেছিল। প্রথম হাঁটতে শিখেছিল। প্রথম স্কুলে গিয়েছিল। হয়তো কোনো মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন তার সন্তানের ফেরার অপেক্ষা করতেন। কেউ হয়তো সেখানে বিয়ে করে সংসার শুরু করেছিল। কেউ হয়তো সারাদিনের পরিশ্রম শেষে সন্ধ্যায় সেই ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এসে ভাত খেত। কোনো বাবা হয়তো নিজের সন্তানকে ভালো স্কুলে পড়ানোর স্বপ্ন দেখত। কোনো মা হয়তো নিজের জন্য নতুন কাপড় না কিনে সন্তানের জন্য একটা জামা কিনত। কোনো বৃদ্ধ মানুষ হয়তো সেই জায়গাটাকেই নিজের শেষ ঠিকানা ভেবেছিল। কারও কাছে জায়গাটা হয়তো ছিল শুধু একটা বস্তি। কিন্তু যারা সেখানে থকত, তাদের কাছে সেটাই ছিল বাড়ি।

হয়তো খুব অগোছালো, হয়তো অভাবের, — তবুও বাড়ি।

একদিন কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব শেষ। একটা বুলডোজার এলো। তারপর শব্দ হল। লোহার দাঁত দিয়ে একের পর এক ঘর ভেঙে পড়ল। টিনের চালগুলো মাটিতে লুটিয়ে গেল। বাঁশের বেড়াগুলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের বহু বছরের জমানো সামান্য জিনিসপত্র ধুলোয় মিশে গেল। কেউ হয়তো তার কাপড়গুলো গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেল না। কেউ হয়তো তার পুরোনো ট্রাঙ্কটা সরাতে পারল না। কেউ হয়তো সন্তানের বইগুলো বাঁচাতে পারল না। কেউ হয়তো নিজের ঘরের দরজাটার দিকে শেষবার তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটা একটা করে ঘর ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল একটা পুরো বসতি। মাত্র কয়েক ঘন্টা। ভাবতে অবাক লাগে - যে জায়গাটাকে তৈরি করতে মানুষের কয়েক দশক লেগেছিল, সেটাকে মুছে ফেলতে কয়েক ঘন্টাই যথেষ্ট হল। বুলডোজার কি জানে মানুষের স্মৃতির ওজন? সে কি জানে একটা ঘর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটা শিশুর শৈশবও ভেঙে যায়? সে কি জানে একটা টিনের চালের নীচে কোনো মায়ের কত রাত কেটেছে? সে কি জানে সেই ভাঙা দেওয়ালের সঙ্গে কারও স্বপ্ন হয়তো মাটিতে পড়ে যায়? না, বুলডোজার শুধু ইঁট, টিন, বাঁশ আর মাটি চেনে। মানুষের জীবন চেনে না। কাগজে হয়তো সেই জায়গাটা এখন আর কোনো বসতি নয়। হয়তো সেখানে নতুন কিছু হবে। হয়তো রাস্তা হবে, বাড়ি হবে, কোনো প্রকল্প হবে, কোনো নতুন নির্মাণ দাঁড়াবে। শহর এগিয়ে যাবে। মানুষও এগিয়ে যাবে।

কিন্তু যারা সেখান থেকে চলে গেল, তারা কোথায় যাবে? তাদের নতুন ঠিকানা কি শুধু একটা জায়গার নাম? নাকি তাদের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে তাদের পুরোনো জীবনের একটা বড় অংশ? আমরা যারা দূর থেকে দেখি, তাদের গল্প হয়তো খুব সহজ।

"বস্তি উচ্ছেদ" দুটি শব্দ।

কিন্তু এই দুটি শব্দের ভেতরে কত শত মানুষের কান্না লুকিয়ে থাকে, সেটা কি আমরা কখনও ভাবি?

বস্তি মানেই কি শুধু অপরিষ্কার জায়গা? টিনের ঘর? দারিদ্র্য? না।

বস্তিরও একটা ইতিহাস থাকে। সেখানেও মানুষ ভালোবাসে। সেখানেও মানুষ স্বপ্ন দেখে। সেখানেও মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়ান। সেখানেও ঈদের দিন নতুন জামা হয়। সেখানেও পুজোর আলো জ্বলে। সেখানেও অসুস্থ মানুষকে নিয়ে রাত জাগে কেউ। সেখানেও মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। অভাব মানুষের অনুভূতিকে ছোটো করে না। বরং অনেক সময় অভাবের ঘরেই সবচেয়ে বড় মমতা জন্ম নেয়।

আজ বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। যারা ঘর হারিয়েছে, তারা কি আজ কোথাও আশ্রয় পেয়েছে?

কোনো টিনের ছাউনির নীচে?

কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে?

কোনো ফুটপাতে?

নাকি কোনা ভাঙা ফুটপাতে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তারা এই বৃষ্টিটাই দেখছে?

আমি জানি না। শুধু জানি, আমার ব্যালকনি থেকে নীচের সেই ফাঁকা জায়গাটাকে আজ আর ফাঁকা মনে হচ্ছে না। আমার চোখে সেখানে এখনও অসংখ্য ঘর দাঁড়িয়ে আছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটা শিশু বৃষ্টির মধ্যে ছুটছে। কোনো মা তাকে ডাকছেন — "ভিজিস না, ঠান্ডা লাগবে।" দেখতে পাচ্ছি কোনা বাবা সারাদিনের কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরছেন। দেখতে পাচ্ছি

কোনো বৃদ্ধ মানুষ দরজার সামনে বসে আছেন। দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যার পর একটার পর একটা ঘরে আলো জ্বলছে। তারপর হঠাৎ — একটা বুলডোজার। আর সব শেষ। শুধু সেই ক্ষীণ আলোটা যেন এখনও জ্বলছে। হয়তো খুব তাড়অতাড়ি সেটাও নিভে যাবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকব। কারণ আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আলোটা নিভে যাওয়া মানে শুধু একটা বাতি নিভে যাওয়া নয়। এটা হয়তো একটা ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা। একটা বস্তির শেষ নিশ্বাস। কয়েক দশক ধরে সেখানে বেঁচে থাকা মানুষের জীবনের শেষ দৃশ্য।

বৃষ্টি আরও জোরে নামছে। মেঘ আরও জোরে ডাকছে। আর আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাবছি - একটা বুলডোজার খুব সহজেই একটা বস্তি ভেঙে ফেলতে পারে। কিন্তু একটা মানুষের ঘর ভেঙে দেওয়া আর তার স্মৃতি ভেঙে দেওয়া এক জিনিস নয়। ঘর মাটিতে মিশে যায়। টিনের চাল হারিয়ে যায়। দেয়াল ভেঙে যায়। ঠিকানা বদলে যায়।

কিন্তু মানুষের জীবনের পঁচিশ-ত্রিশ বছর কি এত সহজে মুছে যায়? যে শিশুটি সেখানে জন্মেছিল, তার স্মৃতি কি মুছে যাবে? যে মা সেখানে সন্তানকে বড় করেছিলেন, তার বুক থেকে কি সেই ঘরটা মুছে যাবে? যে মানুষটি সেখানে জীবনের সেরা সময়গুলো কাটিয়েছিল, তার মনে কি সেই সরু গলিটা আর কখনও ফিরে আসবে না? আসবে নিশ্চয়ই আসবে। হয়তো কোনা এক বৃষ্টির রাতে। হয়তো কোনো মেঘের গর্জনে হয়তো কোনো ক্ষীণ আলো দেখে। ঠিক যেমন আজ আমার মনে হচ্ছে — নীচে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। সেখানে এখনও একটা বস্তি আছে। শুধু তার ঘরগুলো নেই। মানুষগুলো নেই। কোলাহল নেই। আছে শুধু স্মৃতি। আর আছে - এক টুকরো ক্ষীণ আলো। যেটা হয়তো আজ রাতেই নিভে যাবে। কিন্তু যে মানুষগুলোর জীবন সেই আলোয় একদিন জ্বলেছিল, তাদের গল্প এতো সহজে নিভবে না।

কারণ — বুলডোজার ঘর ভাঙতে পারে, ঠিকানা মুছে দিতে পারে, কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের গল্প মুছে দিতে পারে না।

–x–

শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক ঃ স্মৃতি, শ্রদ্ধা ও স্বপ্নের ঠিকানায়

জগদীশ সাহা (সহকারী শিক্ষক)

ছাত্র জীবনে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে, আমাদের প্রত্যেকের মনে ভবিষ্যত জীবনের কিছু আশা-আকাঙ্খা বাসা বাঁধতে শুরু করে। আর সেই ছাত্র জীবনে বেড়ে ওটার সময় কিছু মানুষ আমাদের জীবনে নীরবে এসে এমন একটি জায়গা করে নেন, যা সময়ের সাথে সাথে আরও গভীর হয়ে যায়। উনারা শুধু শিক্ষক হয়ে ওঠেন না, হয়ে ওঠেন আমাদের জীবনের নির্মাতা।

আজকে যিনি আমার কর্মরত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, একদিন তিনিই ছিলেন আমার পাঠরত বিদ্যালয়ের আমার মতো অনেক সহপাঠিরই প্রিয় স্যার - যার হাতের লেখা ব্ল্যাক বোর্ডে উঠলে ক্লাসটাই অন্যরকম হয়ে যেত, যার কণ্ঠে পড়া শুনলে কঠিন বিষয়ও সহজ হয়ে উঠত, আর যাঁর চোখের দিকে তাকালে নিজের অজান্তেই ভালো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে মনের মঝে জেগে উঠত। যে মানুষটি একদিন আমাদের শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে পাঠ দান করতেন, তিনি আমার কর্মরত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক — এ অনুভূতি গর্বের, শ্রদ্ধার এবং অনুপ্রেরণার। সময় বদলায়, দায়িত্ব বদলায়, কিন্তু কিছু মানুষের মূল্য কখনো বদলায় না। আমার প্রাক্তন শিক্ষক থেকে উনার আজকের প্রধান শিক্ষক হয়ে ওঠার এই যাত্রা কেবল পদোন্নতির নয়, এটি একটি আদর্শ গড়ে তোলার গল্প। ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি আমার জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আজকে আমি এই বিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও, ছাত্র জীবনে উনার জীবন বিজ্ঞানের ক্লাস আজও আমার মনে জীবন্ত। উনি জীবন বিজ্ঞানের ক্লাসকে প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, যেমন জীবন বিজ্ঞানের একটি অংশে জলে দ্রবণীয় ও ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে বারবার গুলিয়ে ফেলায় তিনি ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনকে মনে রাখবার একটি সহজ উপায় আমাকে বলেছিলেন, সেটি A, K, D, E অর্থাৎ (Arun Kumar Das ই) আমাদের জীবন বিজ্ঞান ক্লাস নেন। এইভাবে আরও অজস্র উদাহরণ আছে, যার মাধ্যমে জীবন বিজ্ঞান বিষয়টিকে উনি আমার বা আমাদের কাছে আরও সহজ ও সরল করে উপস্থাপন করতেন। যার ফল স্বরূপ নিজে রসায়ন বিষয়ক শিক্ষক হলেও কখনো কখনো বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞান ক্লাসে যেতে হলে, ছাত্রদেরকে একটু আধটু সময় জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ক্লাসের মূল্যবান সময়টুকু কাটিয়ে দিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

শিক্ষক হিসেবে তিনি আমাদের শুধু পাঠ্যসূচির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। পাঠ্য বইয়ের বাইরেও যে একটি বিশাল জগৎ আছে — চিন্তাশীল, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও স্বপ্ন দেখা — এই সবকিছুর পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর হাত ধরেই। পরীক্ষায় নম্বরের চেয়েও যে চরিত্র গঠন অনেক বড়ো, তিনি বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কড়া অনুশাসনের মধ্যে ছিল ভবিষ্যত নির্মাণের দৃঢ়তা, আর উনার নীরবতায় ছিল আমাদের প্রতি গভীর আস্থা।

২০১৩ সালে আমি শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করবার পর উপলব্ধি করি — একজন শিক্ষকের দায়িত্ব কতটা গভীর ও বিস্তৃত। তখন উনার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পায়। আমি উপলব্ধি করতে পারি, একজন আদর্শ

শিক্ষক কীভাবে নীরবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

এরপর ২০২০ সালে আমার কর্মরত প্রতিষ্ঠান লালগোলা এম.এন. একাডেমিতে উনার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান আমার জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গর্বের ঘটনা। একদিন যাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছি, আজ তাঁরই সহকর্মী হিসাবে থাকতে পারা আমার কাছে অশেষ সৌভাগ্যের। এই পরিবর্তন কেবল পেশাগত নয়, এটি আমার জীবনের এক গর্বের অধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে উনার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী। তিনি শুধুমাত্র আমার শিক্ষকই ছিলেন না, বরং একজন আদর্শ মানুষ ও পথ প্রদর্শক হিসেবেও বারবার আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আজও কোনো পেশাগত বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উনার দেওয়া শিক্ষাই আমাকে পথ দেখায়। ওনার উপস্থিতিতে শিক্ষা আমার কাছে কেবল পাঠ্যসূচিভিত্তিক নয়, এটি হয়ে উঠেছে জীবনমুখী; বিদ্যালয় কেবল একটি ভবন নয়, হয়ে উঠেছে এক প্রাণবন্ত পরিবার। একসময় যিনি আমার হোমওয়ার্ক যাচাই করতেন, শাসন করতেন, আবার উৎসাহ দিতেন - আজ তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের দিশারি। উনার জীবনের পথচলা আমাকে শিখিয়েছে, সাফল্য কখনো হঠাৎ আসে না, এটি আসে একনিষ্ঠ পরিশ্রম, নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যাবসায় ও দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে।

– x –

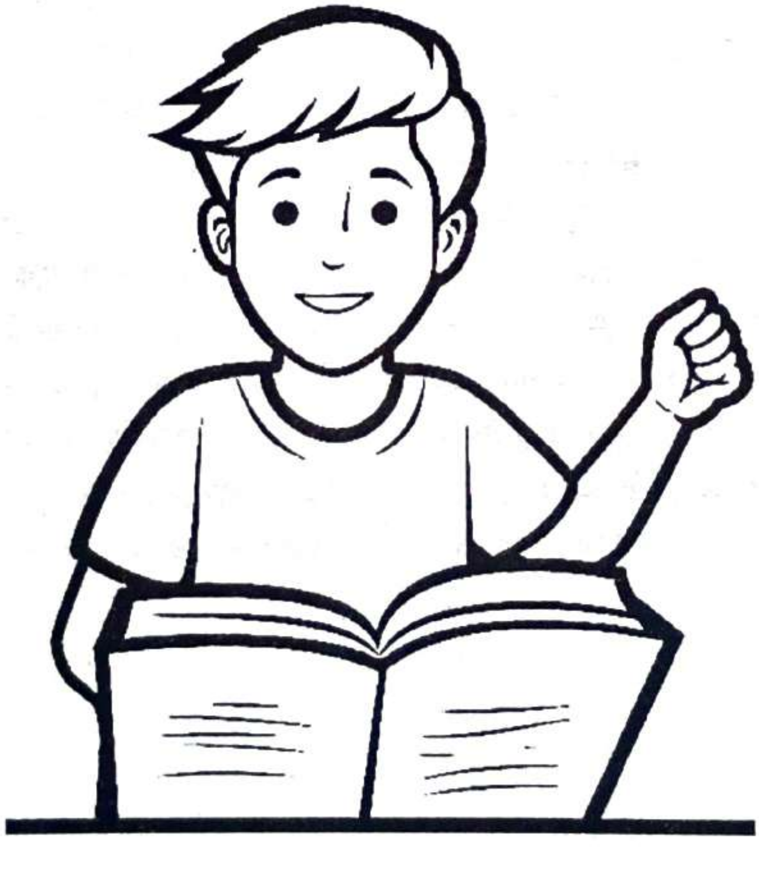

ছাত্রীদের নৃত্য প্রদর্শনী

সুব্রত কাপ (U-17)

ক্রিকেটে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন টিম (2024)

ছাত্রীদের কবাডি টিম

যোগ দিবস

অদ্রিজ চৌবে

NCC (2026)

NCC Team

বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা

স্কুলের আর্ট গ্যালারী

স্কুলের সাইন্স মিউজিয়াম

দুপুরের আহার (পি.এম.পোষণ)

হাতে-কলমে বিজ্ঞান (স্টেম ল্যাব)

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কারিগর

স্মৃতির বৃষ্টিতে ভিজে

দোদুল রায় (প্রাক্তন ছাত্র)

মননে বিকশিত স্মৃতির কোলাজ, যেন সময়ের ফ্রেমে বন্দী একটি অনুভূতির ছবি, যেটি ঝুলে আছে আমার জীবনকালের পশ্চিম দেওয়ালে। মাঝে মাঝে দোল খাই আমারই দীর্ঘশ্বাসে। বিফল কান্না নিয়ে ডুবে যায় মন, মেনানকলির কুয়াশায়। স্মৃতি মানে মনের গহীনে অজস্র কথামালা। স্মৃতিগুলো যেন সময়ের গ্রন্থে স্বর্ণালী পাতায় লেখা, সব ফেলে আসা দিন যাপনের হাজারো রঙিন-মলিন ঘটনা। আমার নিজভূম লালগোলায় দিন যাপনের সেই সব দিন-রাত্রি খুঁজতে গিয়ে, হৃদয়ের অতলান্তে ঢেউ তোলপাড়। যেখানে আমি গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে পাখা মেলেছি, এখন সেখানে দীর্ঘ দিনের চেনা দৃশ্যপট, চেনা পথ-ঘাট, স্কুল বাড়ি, অনেকটা যেন বদলে গেছে। আমাদের গর্বের স্কুল এম.এন. একাডেমির পূর্ব দিকে পুকুর পাড়ে যে দীর্ঘকায় পবন - ঝাউ (ক্যাসুয়ারিনা) গাছটি ছিল, যার শীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনতাম বাতাসের ঝিরিঝিরি মায়াবী শব্দ, সে ছিল সবার রোদেলা দুপুরের শীতল আশ্রয়। আজ আর সে গাছ নেই। সে সময় ছিল কত মন ভোলা গোধূলি বিকেলের আদুরে মোহনীয় মুহূর্ত যা কলকলির জলছোঁয়া বাঁধানো ঘাটে, অনির্বচনীয় প্রশান্তির স্পর্শ নিয়ে হৃদয় ছুঁয়ে যেত। কত যে নিবিড় সন্ধ্যা কেটেছে সঙ্গোপনে মন খারাপ নিয়ে, আবেগ জড়ানো আমার প্রিয় স্কুলের সামনে মাঠের সবুজ ঘাসে।

আবার কোনো কোনো দিন ঘন জ্যোৎস্না মাখা ঝকঝকে রাতে এই স্কুল মাঠেই বন্ধুদের সাথে বসে কেটে গেছে অনেকটা করে সময়। কথপোকথনে থাকতো কত সুখ-দুঃখ বেদনা জারিত কথা, কত হাসি, কত চেনা সুর, কত জিজ্ঞাসা, রৌদ্র দিনের কত বাসনা! সব রাতের আকাশে তারামন্ডলে ঢাকা পড়ে গেছে। কোনো কোনো সন্ধ্যায় মাঝ মাঠে আবছায়া আলোয় বসে দূর থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান শোনা "মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য ..."।

আবার এখানে বসেই পুষ্পের দিন ছিনিয়ে আনার স্বপ্ন দেখা। আমার এই স্মৃতি সিক্ত স্কুল মাঠে দাঁড়িয়ে, আবেগের চশমা চোখে চারপাশ তাকিয়ে, মনে হল যেন যুগ যুগান্তরের চেনা এই মাঠ। স্মৃতির গহীনে ডুবে গিয়ে খুঁজি, সেই সব সন্ধ্যার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া চিহ্নগুলো। সময়ের বেড়াজাল ছিঁড়ে বেড়িয়ে এসে অপূর্ণ ইচ্ছেগুলোর প্রেতাত্মারা যেন কুচকাওয়াজ করছে আর হাততালি দিয়ে গাইছে "আমাকে আমার মত থাকতে দাও ..."। বন্ধুরা সব দিকবিদিক চলে গেছে। জীবনে বসন্তের হিসাব রাখার খাতাটাও কোথায় যেন নিরুদ্দেশ। মনে আছে শেষ পর্যন্ত হয়নি তখনও সেদিনের সেই সব অমীমাংসিত চপল বিতর্কের সমাধান। অভিনয়ে কে বড়ো অভিনেতা উত্তম না সৌমিত্র, চলচ্চিত্র পরিচালনায় সত্যজিৎ না মৃণাল, রবীন্দ্র সংগীতে সুচিত্রা না কণিকা! বিদেশী চলচ্চিত্রে চ্যাপলিন না গদার নাকি হ্যারলড লয়েড! একসাথে কত কথা, কত হাসি, কত স্বপ্ন ছিল স্থির। স্মৃতির মায়া জালের আলপনা মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমার ফেলে আসা তারুণ্যে রাঙা, রঙিন বেলার, অনেক না বলা অনুভবের কথা। আমার স্মৃতি জাগানিয়া মন, নীরবে স্মৃতির বৃষ্টিতে ভিজে, এক মাঠ হাহাকার নিয়ে ফিরে চলে আপন আলয়ে।

— x —

উৎকর্ষতার খোঁজে বিদ্যামন্দিরের সেকাল ও একাল

উজ্জ্বল কুমার মিত্র (প্রাক্তন ছাত্র)

আমাদের সময় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণি পাস করে পঞ্চম শ্রেণির গন্ডি থেকেই পড়াশোনার জন্য লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমিতে এডমিশান টেস্ট দিতে হতো। সেই সুবাদে ১৯৮৫ সালের কোনো একদিন লালগোলা এম এন একাডেমিতে অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষা দিতে বসেছিলাম। পারিবারিক সুবাদে বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকদের চিনতাম ও পরিচিত ছিলাম। মাননীয় নিলয় রায় মহাশয় আমি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছি তখন তিনি সেই পরীক্ষা হলেন পর্যবেক্ষক ছিলেন। বেশ মনে আছে "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" এই কবিতা বা গানের প্রথম দুটি স্তবক লিখতে হবে এটি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে ছিল। যে-কোনো কারণেই হোক প্রথম স্তবক লেখার পর দ্বিতীয় স্তবক মনে আসছিল না। আমি প্রথম স্তবক লিখে বেশ কিছু জায়গা ছেড়ে অন্য প্রশ্নের উত্তরে চলে যাই, যাতে যখন সেই দ্বিতীয় স্তবক মনে পরবে তখন লিখবো। সেই প্রশ্ন পত্রের সব উত্তর দেওয়া সময়ের অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও, সেই কবিতার বা গানের দ্বিতীয় স্তবক কিছুতেই মনে আসছিল না। নিলয়বাবু ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। উনি আমার কাছে এসে প্রথমে বললেন "এতটা জায়গা ছাড়া কেন?" আমি সত্যি কথাটা বলালাম। এরপর তিনি বলেছিলেন "অনেক সময় আছে মনে কর, তার আগে ঠান্ডা জল খেয়ে আয়।" আমি সেটাই করলাম কাজ হল না। উনি কিছুক্ষণ পর আবার এলেন বললেন - "মনে পরলো কিছু?" আমি না বললাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোদের বাড়ির উটোনে দাঁড়ালে সূর্য চাঁদ সবই তো দেখা যায় আমি বললাম "হ্যাঁ"। উনি বললেন - "তবে এবার তোর লিখে দেওয়া উচিত।" তবুও মাথায় এল না। আর কিছুক্ষণ পর উনি পাস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম মৃদু স্বরে গান করছেন। পিন অফ সাইলেন্ট পরীক্ষা হলে উনার গাওয়া মৃদু স্বরের গান বেশ সুন্দর লাগছে। উনি গাইছেন "ধনধান্য পুষ্পে ভরা।" আমি শুনছি ছন্দে আমার পাস দিয়ে প্রথম স্তবকের শেষ লাইন গাইতে গাইতে সামনের দিকে যাচ্ছেন – "সকল দেশের রানি সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।" গানটা শেষ করেই দাঁড়ালেন, আমার মাথায় বেজে উঠলো "চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় এমন উজল ধারা।" এবার আমি দ্বিতীয় স্তবক পরীক্ষার খাতায় লিখে ফেলেছিলাম। আমার মস্তিষ্কের ভেতর একটা প্রসেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভুলে যাওয়া স্তবকটি। আমি সেই পঞ্চম শ্রেণির অ্যাডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে লালগোলা এম এন একাডেমিতে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। সেদিন এক শিক্ষকের মূল্যবান প্রসেস আমার জীবন গতির ধারাকে একটা কিংডমে ঢুকতে সহায়তা করেছিল। আমার বর্তমান বোধে আমি মনে করি এটাই উৎকর্ষতা।

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ক্লাস টিচার মাননীয় রনেন দাস মহাশয়। রনেনবাবু আগে বন্ধু তারপর শিক্ষক। উনার কাছে আমাদের জন্য সব কিছুই সহজ। শিক্ষার পাঠ যেমন চলছে তার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞান ও জীবন দর্শন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রনেনবাবুর ক্লাস। একদিন আমার বাড়িতে কোনো কিছু নিয়ে মায়ের বকুনি খেয়ে মন ভীষণ ভারাক্রান্ত। দুঃখে, না খেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিলাম আমি। আমার বাবা বিশ্বদেব মিত্র (নব মিত্র) রনেনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রনেনবাবু লালগোলাতে অনেক সাংস্কৃতিক চর্চা করেন তার পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতায় আমার বাবা। সেই সুবাদে রনেনবাবুর সঙ্গে বাবার ভীষণ ঘনিষ্ঠতা। সেদিন আমি বাড়ি থেকে

রাগ দুঃখ অভিমান নিয়ে না খেয়ে স্কুলে গিয়েছি, এই কথা বাবা একটা চিরকুট মারফত কোনো পত্র বাহককে দিয়ে রনেনবাবুকে পাঠান। সেদিন যথারীতি রনেনবাবু ক্লাস করাচ্ছেন একই ভঙ্গিতে। বাড়ি থেকে যে দুঃখ অভিমান নিয়ে গেছি তা মিটে গেছে উনার ক্লাসে। আমাদের মতো ছাত্রদের তখন রনেনবাবুর প্রতি মগ্নতায় ধ্যান। ক্লাস শেষ হঠাৎ রনেনবাবু আমাকে ডাকলেন। হাত ধরে নিয়ে গেলেন টিচার রুমে। পরের ক্লাস মাননীয় মন্টু বসাক মহাশয়ের। রনেনবাবু মন্টুবাবুকে টিচার রুমে বললেন "উজ্জ্বলকে আমি নিয়ে যাচ্ছি ও আপনার ক্লাসে থাকছে না।" মন্টুবাবু প্রচন্ড রাগী। ছাত্রদের জন্য ত্রাস ছিলেন, মারতেন খুব। সেই শিক্ষকও বললেন ঠিক আছে। এবার রনেনবাবু হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে সোজা দাদুর প্যাঁড়ার (মিষ্টি) দোকান। বেশ কিছু সুস্বাদু মিষ্টি কিনে আমার সামনে রেখে সামনের বেঞ্চে বসেছেন তিনি। প্রথমে বললেন খেয়ে নে। প্রায় ৫ মিনিট আমি হাত গুটিয়ে বসে ছিলাম খাইনি। এবার রনেনবাবু বললেন "রাগ হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি সব শুনবো। তুই আগে খেয়ে নে।" আমার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। রনেনবাবু এবার নিজে হাতে মিষ্টি নিয়ে আমার মুখের সামনে আনলেন। আমি খেতে শুরু করলাম। খাওয়াতে খাওয়াতে রনেনবাবু বলছেন "খুব জেদি তুই। কিন্তু এই জেদের মূল্য নেই। এই জেদটা লেখা পড়া, খেলাধূলা, উন্নত ভাবনা ও সমাজের উন্নতির জন্য যদি কাজে লাগাতে পারিস তবেই এই জেদের মূল্য থাকবে।" সঙ্গে একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন - "Choose the people you win with." জানি না একে সম্মোহন বলে কিনা? কিন্তু আজও আমি রনেনবাবুর মতো মানুষের কাছে সম্মোহিত হতে চাই। পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও শিক্ষা আছে যা জীবনের গতিকে পাল্টে দেয়। এই উৎকর্ষতায় আমি লালগোলা এম. এন. একাডেমির ছাত্র।

১৯৯০ সাল, মাধ্যমিক পাশ করে ক্লাস ইলেভেনে কমার্স নিয়ে পড়া শুরু আমাদের লালগোলা এম এন একাডেমিতে। ক্লাস ইলেভেন থেকে কো-এড , মনে এক নতুন অনুভূতি। খেলা-ধূলা, পড়া-শোনার সঙ্গে দুষ্টুমি নতুন সংযোজন। ভালো খারাপের বোধের অভাব থেকে, না বুঝে কিছু উৎশৃঙ্খলতা দানা বেঁধেছে। এই ভাবেই হেড মাস্টার রুমে চিঠি এসেছে আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মাননীয় শ্রী মদন মোহন রায়ের ঘরে ডাক পড়েছে চিঠিতে থাকা নামগুলোর। ঘটনা চক্রে ইন্টারস্কুল ক্রিকেট খেলার জন্য ডাক পড়ার দিন আমি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। বাকিরা তুলোধনা হয়েছেন হেডমাস্টার রুমে। বিপর্যস্ত বন্ধুমহল। এরপর আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আমাকেও একাই যেতে হয়েছে সেই রাসভারি স্বচ্ছ লাল আভার বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ অভিভাবক মদনবাবুর কাছে। আমার অবস্থা একটা জড় পদার্থের মতো। সেই অবস্থায় হেডমাস্টার রুমের ঘরের সামনের দরজায় গিয়ে "স্যার আসবো"। অনুমতি সাপেক্ষে হেড মাস্টার রুমে প্রবেশ। মদনবাবুর বাম পাশে দাঁড়ানোর অনুমতি মেলে। উনার হাতে লিখিত কিছু কাজ যা তিনি মনোযোগ সহকারে করছিলেন। সেটা থামিয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ার থেকে কিছু চিঠি বের করে আমার সামনে রাখলেন। প্রায় ৫০টির উপর আমাদের নামে কমপ্লেইন করা চিঠি। বয়ান সবগুলোর এক্। চিঠিতে যে ১০ বা ১১ জনের নাম আছে তার মধ্যে আমার নাম প্রতিটি চিঠিতে ৫ বা ৬ নম্বরে। আমি নিজের চোখে দেখছি। হঠাৎ করে মদনবাবু আমাকে বললেন — "এখানে যাদের নাম আছে তার সঙ্গে তোমার পার্থক্য কী?" আমি মদনবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সহকারী প্রধান শিক্ষক মাননীয় মহিমা রঞ্জন দাস আমার ঠিক পাশেই চেয়ারে চুপ করে বসে রয়েছেন। সেই নিশ্চুপ সময়ের মধ্যে হেডমাস্টার মশাই বললেন — "জানো তুমি কোন পরিবার থেকে এসেছো?" আমার মনে একটা অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছিল কারণ খুব বড়ো কিছু

দোষ না করলেও, না বুঝে মজার ছলে কিছু একটা তো করেছিলাম। সেই অনুশোচনা থেকে, চোখ দিয়ে জল অনবরত পড়তে থাকলো। কিন্তু কোনো কান্নার আওয়াজ বা ফুপানি নেই। হেড মাস্টার মশাই বললেন — "যে ১১ জনের নাম আছে তার মধ্যে ২ জন বংশ পরম্পরায় লালগোলার জন্ম জন্মান্তরের বাসিন্দা। বাকিরা কেউ চাকরি সূত্রে, কেউ ব্যবসা সূত্রে লালগোলাতে আছে। তাদের কার্য পূর্ণ হলে তারা লাগগোলা ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাবে। কিন্তু তুমি এই লালগোলাতেই থাকবে। লালগোলার সুনাম হলে তুমিও তার ভাগিদার হবে, আর লালগোলার খারাপ হলে তোমাকেও সেই বদনাম গায়ে মাখতে হবে। অতএব আগামীতে তোমার চলার পথ শুধু তোমার ভালো করবে তা নয়, তোমার লালগোলার উৎকর্ষতা তোমার ভালো খারাপের উপর নির্ভরশীল।" আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লেসন ছিল সেদিন। যা আমি পেয়েছিলাম ১৯১৪ সালে লালগোলার দানবীর মহারাজা রাজা রাও শ্রী যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের উদ্যোগে স্থাপিত তার পিতা শ্রী মহেশ নারায়ণ রায়ের নামাঙ্কিত বিদ্যামন্দিরে। তাই লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমি আমার কাছে মন্দির। পরিবারের পরেই এখান থেকেই আমার ধর্ম যুদ্ধের পাঠ।

একালের শিক্ষকরা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তাদের ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। সামাজিক ক্ষয় নতুন প্রজন্মের উৎকর্ষতাকে কমিয়ে এনেছে। এটা সামাজিক ব্যাধি বা অবক্ষয়। এর মধ্যে লালগোলা এম এন একাডেমির বেশ কিছু শিক্ষক ছাত্রদের বন্ধু হয়েছে। তাদের সুখ দুঃখে সামিল হয়েছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে ফিরছি। লালগোলার এক পরিবার সেই সফরে যাত্রী হিসেবে আমার সঙ্গী। প্রসঙ্গ উঠল লালগোলা এম এন একাডেমির। যাত্রী পরিবারের সর্বময় কর্তা লালগোলা এম এন একাডেমির ছাত্র এবং আমার থেকে প্রায় ১০ বছরের জুনিয়ার। তাই সেই সময়ের বিদ্যালয়ের উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনা চলছে। সেই সর্বময় কর্তা আজকের এম এন একাডেমি নিয়ে কিছু নেগেটিভ কথা বলছে, ঠিক এই সময় তার ছেলে ক্লাস সেভেনের ছাত্র গর্জে উঠলো। বলল — "আমাদের স্কুল সেরার সেরা। শিক্ষক মহাশয়রা দারুণ ভাবে ছাত্রদের পাশে থাকে। অনেক বোঝায়। খেলাধূলা করতে বলে। মোবাইলে পড়ে থাকতে মানা করে। বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করে। আমাদের হেড মাস্টারমশাই কোনো দরকারি কাজে দাঁড়াতে দেয় না সঙ্গে সঙ্গে অফিসে কাজ করে দেয়। আমাদের স্কুল সেরার সেরা।" আমি শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। বাইরে থেকে সমালোচনা হলেও ভেতরের প্রোডাক্ট এর যখন এত কনফিডেন্ট তখন ভালো তো কিছু আছেই।

আজ ঘটনাগুলো এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরলাম কিছু অভিসন্ধি নিয়ে আজকের প্রজন্মের এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে - নিলয় রায়ের মতো কোনো শিক্ষক তাদের জীবনকে কিংডমে প্রবেশ করতে সহযোগিতা করেছে কিনা? জানতে ইচ্ছে করে - রনেন রায়, অলক সান্যাল, মানস রায়, তরুণ দাসের মতো বন্ধু শিক্ষক তারা বর্তমানে কাকে কাকে পায়? জানতে ইচ্ছে হয় – ছাত্রদের প্রচুর কমপ্লেন জমা পড়ার পরও আজকের শিক্ষকরা ও ম্যানেজমেন্ট কীভাবে তাদের মূল স্রোতে রেখে দিতে সক্ষম? এগুলো ঠিক প্রশ্ন নয়, আমি জানি আমাদের লালগোলা এম. এন. একাডেমিতে আজও সেই উৎকর্ষ শিক্ষক বর্তমান। লালগোলা এম এন একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র এবং আজ তারা সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এটা নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার বেস্ট অপারচুটিনি। লালগোলা এম এন একাডেমি তার মধ্যে বর্তমান প্রধানশিক্ষক অরুণ কুমার দাসকে পেয়েছে। মিঞা জাহাঙ্গীর, জিয়াউর রহমান, আলামিন, বিনোদ ভকত, রাজ কুমার ভকতদা, তরুণদা আরও অনেককে পেয়েছে। যাদের নাম করলাম এরা সকলেই এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। এরা এক একজন নানান বিষয়ে

উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। বর্তমান ছাত্রদের কাছে একটা বড়ো সুযোগ এদের কাছ থেকে ভালোগুলো নেবার। বিদ্যালয় সেজেছে। পড়াশোনার পরিকাঠামোতে ভরপুর নতুন এম এন একাডেমি। শুধু পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। এই পরিকাঠামো ও উৎকর্ষতার সুযোগ যেন হাতছাড়া না করে লালগোলা এম এন একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন প্রজন্ম। বর্তমান সেই সমস্ত শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রবল ইচ্ছে মনের মধ্যে দানা বাঁধে যারা এই প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষ বিশেষ কারণে পপুলার। কারণ রনেনবাবুর সেই কথাটা বারবার কানে বাজে - "Choose the people you win with."

সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের উৎকর্ষতা ও খামতির সমন্বয়ে বিদ্যালয়ের স্বার্থে এগিয়ে এসে বিদ্যালয়ের উৎকর্ষতায় সামিল হয়েছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকমন্ডলিরা তাদের উৎকর্ষতা দিয়ে তা গ্রহণ করেছেন। ভালো লাগা এখানেই — মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের দানের পরম্পরা আজও জারি আছে ও আগামীতে এই বিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসায় তা জীবিত থাকবে। এই বিদ্যালয় থেকে সৃষ্টি হবে রাষ্ট্রের উৎকর্ষতা। লালগোলা এম এন একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র হয়ে এটা আমার চাওয়া, আশা ও ভরসা। লালগোলা এম এন একাডেমি শুধু একটা বিদ্যালয় নয় এটা লালগোলার পরিচিতি, এটা দেশের হেরিটেজ। তাই - এখান থেকেই চলার শুরু, এখান থেকেই হামাগুড়ি, এখানটাতেই আমার বাসা, আমাদের সকলের ভালোবাসার বাড়ি।

— x —

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী মদন মোহন রায় ঃ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

সুখেন্দু কুমার রায়, প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাক্তন পরিচালন সমিতির সদস্য

"হে গুরুদেব লহ মোর প্রণাম।"

আমি যে মানুষটিকে নিয়ে লেখা শুরু করছি তিনি লালগোলার ইতিহাসে এক অনন্য চরিত্র। শিষ্যের গুরুদেব সম্পর্কে লিখন - এক দুরূহ কাজ। তবুও আন্তরিক চেষ্টা করছি এই অসাধারণ মানুষটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার। বর্তমান প্রজন্ম জানে না পাঁচ দশক ধরে তিনি ছিলেন লালগোলা এম.এন. একাডেমি তথা লালগোলার প্রাণপুরুষ ও এক চরম মূল্যবান সম্পদ — তাঁর বহুমুখী গুণের জন্য। তিনি লালগোলাকে কয়েক দশক এগিয়ে দিয়েছেন। কী বিদ্যালয়ের লেখাপড়া, কী খেলাধূলা, কী বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান, কি বিদ্যালয় পরিচালনা সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পুরাধা ব্যক্তি। আর বিদ্যালয়ের সহকর্মীরা ছিল তাঁর সহযোগী। কে সেই ব্যক্তি? তিনি হলেন লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমির সব থেকে দীর্ঘকালীন পদে থাকা প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় মদন মোহন রায়। এম.এস.সি, অঙ্ক, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি।

হাজার হাজার লোক জীবনের সাধনায় যা দিতে পারে না, কেবল আসে আর যায় ধরাধমে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়ে গেছেন তিনি লালগোলাবাসীকে। এক উজ্জ্বল গতিময় আলোক শিখার মত তিনি এসেছিলেন সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে আমাদের লালগোলায়। আলো কেবল তাঁর বহিরঙ্গেই ছিল না, তাঁর অন্তরও ছিল এক প্রদীপের মতো, যা আজীবন দীপ্ত হয়ে নিজেকে লালগোলাবাসী ও লালগোলা এম.এন. একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীদের উজাড় করে দিয়ে গেছেন। জীবনের সর্বাংশ ধূপের মত ছাই হয়ে গেছে কেবলই লালগোলবাসী ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বাড়ি-ঘর কোনো দিকেই তাকানোর সময় নেই তাঁর। সামনে অনেক কাজ, অনেক পথ। ঠিক যেন কবিগুরুর ভাষায় -

"আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ — তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।"

মদন মোহন রায় এসেছিলেন সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে, কিন্তু অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হয়ে গেছিলেন - 'আমাদেরই লোক" — তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়ী আচরণ, সদাহাস্য মুখমন্ডল, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যখন লালগোলায় প্রথম পা রাখলেন, তিনি অসাধারণ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল রক্তিম আভাপূর্ণ পূরো শ্বেতবর্ণ। সকালে তিনি জেল ময়দানে কুস্তি ও ব্যায়াম অনুশীলন করতেন। তৎকালীন লালগোলা রাজবংশের উত্তরাধিকারী কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় মদনবাবুকে লালগোলা নিয়ে আসেন লালগোলা এম.এন. একাডেমিতে সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসাবে যোগদানের জন্য। মদন মোহন রায় ছিলেন উত্তর প্রদেশের গাজীপুরের সেই পরিবারের লোক যে পরিবার থেকে লালগোলার দানবীর মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়কে দত্তক পুত্র হিসাবে রাজা মহেশনারায়ণ রায় গ্রহণ করেছিলেন।

মদন মোহন রায় অত্যন্ত সরল সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। পরতেন সাদা ধুতি ও খাদির পাঞ্জাবী। তিনি যদি এই ভারতীয় পোশাক না পরতেন, বলা বড়ই কঠিন ছিল তিনি ভারতীয় না ইংরেজ — তার অসাধারণ সুন্দর চেহারা ও রক্তিম ফর্সা রংয়ের জন্য।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিক মানুষ। যেখানেই তিনি থাকতেন কী বিদ্যালয় বিশ্রাম কক্ষে বা অন্যত্র — সর্বত্র একটা হাসির পরিবেশ থাকতো। তিনি ছাত্রদের হাসি-রসিকতার মাধ্যমে শিক্ষাদান কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ফলস্বরূপ শ্রেণিকক্ষে ছাত্ররা একঘেয়েমি অনুভব করতো না। তাঁর শিক্ষাদানের একটা নমুনা দিই। তিনি পড়াচ্ছেন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইংরাজী। তিনি বললেন 'The cat is shorter than a tiger.' বিড়ালের আকার দেখানোর জন্য তিনি বাম হাতটা বুকের কাছে রাখলেন। মেঝে থেকে বুক পর্যন্ত বিড়ালের আকার! ছাত্ররা সকলেই হতবাক। বিড়াল তো বাঘের চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। পরমুহূর্তেই তিনি বললেন ডান হাতটা নীচে রাখতে তিন ভুলে গেছেন। ছাত্ররা স্বস্তি অনুভব করলো ও শ্রেণিকক্ষে হাসির রোল বইলো। এইভাবে তিনি পাঠদানকে জীবন্ত করে রাখতেন। কবিগরু রবীন্দ্রনাথ এটাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন — "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোনিত স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে।"

তিনি ছিলেন পশুপ্রেমিক। তাঁর বাড়িতে প্রায় ১২ বৎসর এ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল আর ছিল উন্নতমানের গরু। সকালে উঠেই পশুদের সেবা ছিল নিয়মিত কার্য। গরুর খড় কাটা, খেতে দেওয়া তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। তারপর জেল ময়দানে শরীর চর্চার পর বাড়ির সামনের বারান্দয় মাদুর বিছিয়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ছাত্রদের অবৈতনিকভাবে ইংরাজী ও অঙ্ক শিক্ষাদান। এইসব ছাত্রদের বেশীরভাগই সরকারি ও বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছিল।

বেলা ১১টায় তিনি বিদ্যালয় পৌঁছাতেন এবং দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয় চালনা করতেন। সহকর্মীদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধালাভ তিনি প্রচন্ডভাবে পেয়েছিলেন তাঁর সমস্ত কর্মজীবনে। দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিল প্রচন্ড সহানুভূতি। তিনি তাদের বিনা মাইনায় পড়ার বৃত্তি ও প্রচুর বই দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন ছাত্র-প্রেমিক। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।

তিনি ছিলেন দাবা খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী। বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকার ও খবরের কাগজের দাবার ছক সমাধান করতেন এবং ডায়েরিতে প্রায় ৩০/৪০ বছরের দাবা খেলার সমাধান লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এটি ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর একটি। তিনিই লালগোলায় ক্রিকেট খেলার প্রতিষ্ঠাতা। সহকর্মী, ছাত্রদের নিয়ে মাঠে তিনিও নামতেন ক্রিকেট খেলতে। মহান শিক্ষকের বহুমুখী কাজকর্ম এবং বিভিন্ন গুণাবলীবিশিষ্ট এরকম লোক সমাজে দুর্লভ।

তিনি লালগোলা এম.এন. একাডেমিতে প্রায় ৩৫ বৎসর প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদ্যালয়ে যোগ দেন গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে এবং কার্য থেকে অবসর নেন গত শতাব্দীর নয়ের দশকে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৪ সাল থেকে বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাঁর মতো এত দীর্ঘকালীন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব কেউ পালন করেননি।

তিনি ছিলেন প্রচন্ড সৎ। তাঁর সরলতা, লোভহীনতা ও সততার জন্য লালগোলাবাসীর কাছে তিনি হয়েছিলেন প্রিয়। তিনি উঁচু শ্রেণিতে অঙ্ক ও ইংরাজী পড়াতেন। তিনি কখনই শিক্ষাদানে অবহেলা করতেন না। বিদ্যালয়ের শেষ ঘন্টা পড়ে যাওয়ার পরেও আরও আধঘন্টা তিনি উঁচু শ্রেণিতে অঙ্ক করাতেন। ছাত্ররা কখনই

একঘেয়েমি বোধ করত না। তারপর শুরু হতো যোগীন্দ্রভবনের সামনের বারান্দায় বড়ো শতরঞ্জি পেড়ে অফিসিয়াল কাজকর্ম। বেশিরভাগ দিনই সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৬-৩০ মিনিটের মধ্যে বিদ্যালয়ের অপর গুণী শিক্ষক ঁরমেশচন্দ্র রায়কে নিয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখা যেত। এই প্রতিদিনের দৃশ্য এখনও বয়স্কদের স্মৃতিপটে রক্ষিত আছে। সেসময় কম্পিউটার ছিল না। সমস্ত কাজ হাতেকলমে করতে হতো। ইংরাজীতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁর ইংরাজী চিঠি এখনও তাঁর পান্ডিত্যের ছাপ বহন করছে বিদ্যালয়ের অফিস ফাইলে।

প্রধানশিক্ষক হয়ে বিদ্যালয় পরিচালনায় এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেটি গণতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা অর্থাৎ সকল শিক্ষকমহাশয়ের মতামত জেনে সিদ্ধান্ত নিতেন। বিদ্যালয় প্রাশসন চালানোতে শিক্ষকমহাশয়রা ছিলেন তাঁর সহযোগী। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন বিনয়ী, অন্যদিকে যে-কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। সে ব্যাপারে তিনি আপোষ করতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর বিদ্যালয় কাজকর্মে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে ছাত্রদের বিরত রাখতো। পঠন-পাঠন বিঘ্নিত যেন না হয় সেজন্য তিনি জেলাপরিদর্শক অফিসে নিজে না গিয়ে বিদ্যালয়ের অন্য কাউকে পাঠাতেন। শিক্ষাদানকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন, ছাত্ররা ছিল তাঁর হৃদয় ও আত্মা।

তাঁর স্মরণীয় অবদানগুলি ভোলার নয়। ১৯১৪ সালের বিদ্যালয়। বয়সকালে জীর্ণতা ধরবেই। সমস্ত ঘরের বর্গাগুলি জল রসে রসে নষ্ট হয়ে যায়। একটি ঘরে টাইলস্ খসে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। ভাগ্যক্রমে কোনো ছাত্র আহত হয়নি। প্রধানশিক্ষকের নেতৃত্বে অন্যান্য শিক্ষকদের ও বিদ্যালয়দরদী কতিপয় স্থানীয় ব্যবসিকদের নিয়ে লালগোলার বিভিন্ন প্রান্তে আবেদন রাখলেন বিদ্যালয় বাঁচানোর জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই ১০ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হল লালগোলা বাজার ও লালগোলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেই টাকা দিয়ে পুরানো বিল্ডিংয়ের সমস্ত ছাদ ঢালাই-এর কাজ সম্পূর্ণ হল। এর মূল কারণ হল প্রধান শিক্ষক মদনমোহন রায় ও ঁরমেশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্ব — যাদের সততা প্রশ্নাতীত।

মুর্শিদাবাদ জেলায় Students' Health Home-এর প্রতিষ্ঠাকাল। তারা মাঝেমাঝেই প্রোগ্রাম করে অর্থ সংগ্রহের জন্য। একবার তারা মাদক-বিরোধী অভিযান করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে মিছিল বেরোয়। পুরাভাগে ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়গণ। নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান শিক্ষক মদনমোহন রায়। লালগোলার জনগণ অর্থ সংগ্রহ অভিযানে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার টাকা প্রদান করে। এর একমাত্র কারণ ছিল প্রধান শিক্ষকের সততার প্রতি জনগণের আস্থা। এরকম Students' Health Home এর আরো একটি অভিযানও হয়। তাতেও প্রচুর অর্থ সংগৃহিত হয়।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান। সেসময় হেডমাস্টারমশাই-এর বয়সও কম নয়। তিনি এই কর্মসূচীতে নিজেকে উজার করে দেন। লালগোলার মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, লালগোলার মানুষের ভালো করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেজন্যই সেসময় তাঁকে সুদুর রাজা রামপুর থেকে রাত্রি ৮ টার সময়ও আসতে দেখা যেত অভিযানের কাজকর্ম শেষ করে।

বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দিই। গত শতাব্দীর ছয়-এর দশকের শেষ দিকে ও সাত-এর দশকের শুরুর দিকে নকশাল আদালনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পোড়ানোর, বিদ্যালয়ের সম্পত্তি নষ্ট করা - এই সমস্ত উৎপাত দেখা দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। এই প্রধান শিক্ষক মহাশয় আরও

বেশ কয়েকজন শিক্ষকদের যেমন শ্রী পলক সান্যাল প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে অধিক রাত্রিকাল পর্যন্ত বিদ্যালয় পাহারা দিতেন বহুদিন পর্যন্ত। বিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসা তাঁর ছিল এইরকম।

এই সমস্ত গুণাবলী লালগোলার মধ্যে সীমিত হয়ে থাকলো না। উনার গুণাবলীর সুবাস বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। তিনি আদর্শ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামস্বামী ভেঙ্কটরমনের হাত থেকে আদর্শ শিক্ষকের সম্মান নিয়ে লালগোলায় ফেরেন। আদর্শ হিসাবে পাওয়া সমস্ত অর্থ দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নামে একাধিক বৃত্তি ছাত্রদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি যেদিন এই আদর্শ শিক্ষকের পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফেরেন, লালগোলায় তুমুল আলোড়ন উঠেছিল। নিজের বিদ্যালয় তো ছিলই, লালগোলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে এসে উনাকে লালগোলা স্টেশনে সম্বর্ধনা জানান। মিছিলের অগ্রভাগ যখন লালগোলা স্টেশনে, পেছনদিক ছিল পাহাড়পুরের শেষপ্রান্তে। লালগোলার মানুষ এত বড়ো মিছিল কোনোদিন দেখেনি। এই মিছিলে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছিল। বিদ্যালয়ের মাঠেও এই সম্মানের জন্য লালগোলাবাসী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

বিস্ময়ের আরও কিছু বাকী। উনি যে সময়কালে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বেতন মোটেও ভালো কিছু ছিল না। তবুও তিনি দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় তাঁর গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১টি ঘর নির্মাণের টাকা। ঘরটি নির্মাণের পর তিনি তাঁর নাম যুক্ত করতে দেননি। খ্যাতির প্রতি নির্লোভ - এরকম মানুষ বিরল।

উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা একে তরতাজা যুবকের কাছে লালগোলা তাঁর কাজের জন্য হয়ে উঠলো একান্ত আপন, নিজ বাসভূমি। তাঁর কাছেই অঙ্ক শিখেই ১৯৬১ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রথম ব্যাচের ছাত্রদ্বয় উমেদসিং বোকারিয়া ও রণজিৎ সিং বোকারিয়া হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরাই প্রিয়গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়ের শতবর্ষে "মদনমোহন রায় মঞ্চ' নামের এক সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরিতে ৬ লক্ষ টাকা দান করেন। যোগ্য শিক্ষকের যোগ্য সম্মান।

"পুরানো সেই দিনের কথা" — কত কথা হল বলা, কত কথা তবু বাকি।" লেখা দীর্ঘ হল। ছোটো কথায় লিখলে এই মহান মানুষটির চরিত্রের সমস্ত অসাধারণ গুণাবলী উদ্ঘাটিত হতো না। তিনি ছাত্রজীবনে এবং এখানে আসার আগে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু লালগোলায় আসার পর তাঁর আদর্শের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি পছন্দ হয়নি তাঁর। সেজন্য তিনি এখানে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, খেলাধূলা, শিক্ষা এবং সমাজসেবা — সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী। এককথায় বলা যায় মদনমোহন রায় পাঁচদশক ধরে লালগোলায় ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব।

— x —

লালগোলা এম.এন. একাডেমি আমার জীবন বোধের উৎস ভূমি

শ্রী কিষাণ চাঁদ ভকত (সাহিত্যরত্ন ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক)

সময়ের অমোঘ নিয়মে মানুষের জীবনতরী নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একসময় সাফল্যের তীরে এসে উপনীত হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অর্জিত হয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গড়ে ওঠে নিজস্ব জীবন দর্শন এবং প্রাপ্তি ঘটে নানা বৈষয়িক এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্মাননারও কিন্তু জীবনের এই পরিণত সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে যখন আত্ম দর্শনের গভীরে নিমগ্ন হই, তখন স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয় আমার এই অর্জনের মূল ভিত্তিভূমি আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠ লালগোলা এম.এন. একাডেমি। একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসেবে এই প্রাঙ্গণে আমার যে মানসিক ও বৌদ্ধিক জাগরণ শুরু হয়েছিল তাই ছিল আমার উত্তরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণা আর প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকদের আদর্শের সঙ্গে আমার যে সংযোগ তা কোনো সাধারণ স্মৃতিচারণ নয় বরং এক অবিচ্ছেদ্য ও গূঢ়তর অস্তিত্বের সংরাগ। পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে জাতীয় স্তরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের মতো সর্বোচ্চ রাষ্ট্র সম্মানে ভূষিত হওয়ার সময়ও আমি বিনম্র চিত্তে উপলব্ধি করি এই গৌরব আমার একার নয়। এই স্বীকৃতি আসলে আমার সেই মহান শিক্ষকদেরই প্রাপ্য যাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানালোক দিয়ে আমার মত বহু ছাত্রের মানস গঠন করেছিলেন। তাদের সেই নিঃস্বার্থ শিক্ষা আর কঠোর শৃঙ্খলায় আমাকে একজন সুনাগরিক এবং পরবর্তীতে একজন দায়বদ্ধ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

আমার প্রণম্য শিক্ষক প্রয়াত মদনমোহন রায় মহাশয় বিদ্যালয়ের মুকুটে পরিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারের পালক যা বিদ্যালয় জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়, আমারও ১৯৯৭ সালে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মহামান্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে আমাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে, জাতীয় শিক্ষক রূপে অভিহিত করেন। মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী মহাশয় মঞ্চে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন "বন্দেমাতরম, আবার দেখা হবে।" লালগোলা এম.এন. একাডেমির মুকুটে এলো দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কারের পালক। আমার শিক্ষক জীবনের সবচেয়ে গর্বের ও আনন্দের দিন ছিল ১৯৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনটি।

বিদ্যালয় কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান বিতরণের স্থান নয়, এটি উচ্চমার্গীয় দর্শনের একটি সুতিকাগার। এখানে আমি শিখেছিলাম যে শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয় এটি একটি মহান ব্রত। কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি সেই আদর্শকে সমুন্নত রাখার চেষ্ঠা করেছি। বিদ্যালয়ের এই সুনিবিড় আদর্শ আমার রক্তে এবং চেতনায় এমনভাবে মিশে আছে যে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ শেষ হলেও সেই শিকড়ের টান বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধন আরো গভীর ও মহিমান্বিত হয়েছে।

বর্তমান প্রজন্মের প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার স্বনির্বন্ধ আহ্বান —তোমরা তোমাদের মেধা ও মননের উৎকর্ষতা দিয়ে এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে বিশ্বজনীন করে তোলো। মনে রেখো, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়তো কয়েক বছরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ কিন্তু তার প্রভাব আমৃত্যু প্রবাহমান। সততা, নিষ্ঠা এবং জ্ঞানতৃষ্ণা যেন তোমাদের পথপ্রদর্শক হয় তোমরা যেখানেই যাও না কেন তোমাদের শিকড়ের কথা বিস্মৃত হয়ো না।

পরিশেষে আমার এটুকুই বলার যে লালগোলা এম.এন. একাডেমির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা শব্দে প্রকাশ করা অসম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার যে নাড়ির যোগ তা শাশ্বত এবং চিরন্তন। আমি প্রত্যাশা করি আমাদের এই বিদ্যালয় আগামী দিনেও আলোকবর্তিকা হয়ে সমাজ ও জাতিকে পথ দেখাবে। তাই বিনম্র চিত্তে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই -

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

–x–

তিন দশক পেরিয়ে স্বপ্নের আঙিনায়

বিনোদ কুমার ভকত (সহকারী প্রধান শিক্ষক)

১৯৮৫ সাল। সেই দিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। পরণে হাফ প্যান্ট, চোখে একরাশ বিস্ময়, আর মনে এক অজানা ভয় নিয়ে, গুটিগুটি পায়ে প্রথম পা রেখেছিলাম এই লালগোলা এম.এন. একাডেমির প্রাঙ্গণে। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া সেই ছোট্ট ছেলেটি তখন জানত না এই চত্বরটিই একদিন তার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে উঠবে।

দেখতে দেখতে সময় পেরিয়ে গেল ১৯৯০-এ মাধ্যমিক আর ১৯৯২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে যখন এই স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বুকের ভেতরটা হু হু করছিল। মুহূর্তের জন্য গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম - "আমি ফিরবই। ছাত্র হিসেবে আজ বিদায় নিচ্ছি ঠিকই কিন্তু একদিন শিক্ষক হিসাবে এই গেট দিয়েই আবার ভেতরে প্রবেশ করব।"

এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। একাডেমিক পড়াশোনা চালিয়ে গেছি - অনার্স সহ বি.এস.সি, এম.এস.সি শেষ করে ১৯৯৮ সালে রেলওয়ে সার্ভিসের চাকরিতে যোগদান করলেও আমার স্বপ্ন তো ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম.এন. একাডেমিতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করা। এস.এস.সি পরীক্ষাও ভালো হয়েছিল কিন্তু সমস্যা হল ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে। রাজকুমার ভকত আর বিনোদ কুমার ভকত আমরা দুই ভাই একসাথেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং ইন্টারভিউ বোর্ডেও আমরা পরপর ডাক পাই। দাদা ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি প্রবেশ করতেই ওঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন - "রাজকুমার ভকত কে হয়?"

আমি বললাম "আমার দাদা।"

তিনি বললেন — "আমরা একই বাড়িতে দুজনকে চাকরি দেবো না। তোমার বয়স কম। তাছাড়া তোমার মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত একাডেমিক রেজাল্ট ভালো। অতএব যাও তুমি পি.এইচ.ডি করো।"

রাগ হল মনে মনে — এটা কি দয়ার দান নাকি! যেহেতু আমি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাচ্ছি সেক্ষেত্রে এইসব অবান্তর কথার কী মানে হয়! অবশ্য মনের রাগ মনেই চেপে রাখলাম এই আশায় যে, মুখে বললেও তাঁরা নিশ্চয়ই এটা করবেন না। অথচ প্যানেল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গেল তাঁরা মুখে যেটা বলেছিলেন কাজেও সেটাই করেছেন। এরপর বাইশ (২২) বছর লেগে যায় আমার মারোয়ারী পট্টির বাড়ি থেকে এম.এন. একাডেমির কয়েকশো মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করতে।

২০০৩ সালে আমি জলঙ্গীর চোয়াপাড়া দুর্লভের পাড়া বিদ্যানিকেতনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। সকাল ৬:৪৫ এর ট্রেন ধরে লালগোলা থেকে বহরমপুর। বহরমপুর থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা জার্নি করে স্কুলে পৌছানো। আর মর্নিং স্কুলের সময়ে ভোর তিনটের ট্রেনে বহরমপুর গিয়ে বাসে আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে যেতে হতো কারণ সকালের দিকে বাসে সিট পাওয়া যেত না। প্রায় সাড়ে চার বছর এইভাবে চাকরি করার পর ২০০৭ সালে পরীক্ষা দিয়ে সাগরদীঘি ব্লকের কান্তনগর হাই স্কুলে চাকরি পাই। সে

আবার আর এক ইতিহাস। আপ-ডাউন পনেরো পনেরো ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা সাইকেলে যাতায়াত করতে হতো। বর্ষার সময় সাইকেলের চাকার কাদা ছাড়াতে ছাড়াতে স্কুলে যেতে হতো আবার একই ভাবে ফিরে আসতে হতো। তার ওপরে সাঁতার না জানা আমি প্রতিদিন গঙ্গা নদী পার হতাম ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে দুরুদুরু বুকে। নৌকা বলতে একটাই, সেটা মিস করলে গঙ্গার ঘাট থেকেই ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতে হতো। ওখানে প্রায় সাত বছর চাকরি করেছি। ২০১১ সাল নাগাদ সেখালিপুর হাই স্কুলে আসি। আর লালগোলা এম.এন. একাডেমিতে আসি ২০২২ সালে অর্থাৎ প্রায় দশ বছর পর। ২০২৪ সাল থেকে আমি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। কাজটা মোটেই সহজ নয়। নির্ধারিত ক্লাস করার পরেও, প্রতিদিনই অনুপস্থিত শিক্ষকদের জায়গায় প্রভিশনাল রুটিন তৈরি করে ঠিকভাবে ক্লাস পরিচালনা করা; সেই সাথে কোন্ ঘরে ফ্যান নেই, কোন্ ঘরে বেঞ্চ কম, কোন্ ছেলে দুষ্টুমি করছে কোন্ ছেলে স্কুল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সেসবের তদারকি করা। ঠিক সময়ে পরীক্ষা নেওয়া এবং তার জন্য মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা - এসব তো আছেই। অবশ্য দায়িত্ব নিতে আমি ভয় পাই না। কখনও সাময়িক ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সাথে সাথে নিজেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই — "এই জায়গাটায় পৌঁছানোর জন্য তুমি সারা জীবন কত পরিশ্রম করেছ!"

আমার এই লেখার যারা পাঠক-পাঠিকা, বিশেষ করে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে কথাটা বলার, স্বপ্ন দেখার সাথে সাথেই স্বপ্ন পূরণের জন্য ধৈর্য ও ঐকান্তিক ইচ্ছা শক্তি থাকা দরকার তবেই তোমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। এটা শুধু আমার মুখের কথা নয়। সেই কারণেই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। ভালো থেকো আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা। তোমাদের জন্য রইল আমার শুভকামনা আর অন্তরের ভালোবাসা।

— x —

আমার প্রিয় লালগোলা এম.এন একাডেমি

তরুণ কুমার মন্ডল (সহকারী শিক্ষক)

১৯১৪ সালের ৮ই জানুয়ারি লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর পিতার স্মৃতিকে চির ভাস্বর করে রাখতে এবং বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে শিক্ষার আলো পৌছে দিতেই এই মহেশ নারায়ণ একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত একদিকে যেমন অনেক প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন তেমনি অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীও তৈরি করেছেন। যারা দেশে ও বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন বা করছেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যে পরিকাঠামো (School Building) এবং যে পরিচালন কমিটি ছিল বর্তমানে তার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। কালের নিয়মে বিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে ৫০ বৎসর সূবর্ণ জয়ন্তী, ৭৫ বৎসর প্ল্যাটিনাম জুবিলী এবং ১০০ বৎসর গোল্ডেন জুবিলী। আমি ছাত্রাবস্থায় ৭৫ বৎসরের প্ল্যাটিনাম জুবিলী দেখেছি এবং শিক্ষকতায় যুক্ত থেকে শতবর্ষ পালন করেছি। প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে স্বর্গীয় প্রধান শিক্ষক মদন মোহন রায়-এর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে পুরনো ভবনের সংস্কার দেখেছি। এলাকার মানুষের আর্থিক সাহায্য শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও সেই সময়ের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের Donation নিয়ে গোটা বিল্ডিং-এর ছাদ মেরামতি করতে। পরবর্তীতেও কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে কিন্তু তা আধুনিক রুচিসম্মত বা যুগোপযোগী নয়। প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে অনেকে যোগদান করেছেন এবং তাঁরা নিজের মতো চিন্তাভাবনায় বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

একটা সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন একদা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সম্মাননীয় শ্রী অরুণ কুমার দাস। তিনি যোগদানের সময় বিশেষ সূত্র মারফত জানতে পেরেছিলাম যে, একজন ভালো হেডমাস্টার আসছেন। কেউ বলেছিল তোমরা একজন Digital Headmaster পাচ্ছ। সব বিষয়ে তিনি ভীষণ upto date। যাইহোক তিনি যোগদান করার পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। উন্নয়নের ভাবনা অবশ্য অবশ্যই Man to man vary করে। তবে তিনি যে মনের মণিকোঠায় অনেক ভাবনা নিয়ে এসেছেন তা তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও কর্মদক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিনি যোগদানের পর কোনো শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীকে অবসর নেওয়ার পর পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কাল বিলম্ব হয়নি এটা উনার একটি বড় Achivement। সব কিছু যে সহজেই হয়েছে তা কিন্তু নয়।

একদিকে প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী মিলন ঘোষ মহাশয় অন্যদিকে প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান সম্পাদক প্রধান শিক্ষক শ্রী অরুণ কুমার দাস, প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী সুখেন্দু কুমার রায় ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় প্রথম তিনি একটি প্রাক্তনী সংসদ তৈরি করেন কিছু সংস্কারমূলক কাজের জন্য এবং তাতে তিনি সফল হন। 'কথায় বলে না রতনে রতন চেনে' — তিনি এই রত্নদের এবং বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তৈরি করেন আর্ট গ্যালারী, মহারাজার পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুখে যোগীন্দ্র নারায়ণের একটি আবক্ষ মূর্তি ছিল। বিভিন্ন সময়ে বোর্ড, কাউন্সিল-এর পরীক্ষার সময় ছোট-বড় গাড়ি প্রবেশে সমস্যা দেখা দেয়। আধিকারিকরা Objection জানান

Confidential কাগজপত্র নিয়ে ঢুকতে ও বেরুতে সত্যি অসুবিধা হচ্ছে তাই তিনি ভাবলেন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে মূর্তিটিকে অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করবেন। তা করতে গিয়ে অবশ্য তাকে কম কথা শুনতে হয়নি। এ বিষয়ে একটা ছোট্ট ঘটনার কতা বলি —

প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে অরুণবাবু (প্রধান শিক্ষক) যখন দেখা করে কথা বলতে যান আমিও সঙ্গে ছিলাম। তিনিতো আমাদের দেখে রেগেমেগে বলেই বসলেন যে, অরুণ তোমার চার চাকার গাড়ি ঢুকতে পারছে না বলে মূর্তিটাকেই ভেঙে দিচ্ছ। একটু হেঁটে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে তোমার খুব কষ্ট। ভাঙো তোমার যা ইচ্ছে করো তবে আমি বলবো এটা ঠিক হচ্ছে না। কথাগুলো শুনে অরুণবাবু বিচলিত সেদিন হননি। রমেশবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনীতভাবে পুরো বিষয়টি বললেন এবং সমস্তটা শোনার পর রমেশবাবু বলেছিলেন যে, আমার কাছে আসলে ভুল তথ্য এসেছে। যাইহোক তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও।

অরুণবাবু (প্রধান শিক্ষক) এরপর বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করালেন Science Musium। ছাত্রদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পেভাল ব্লক বসিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বর্ষার দিনে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়। আর একটি ঘটনা এই সময়ে জবর দখল হয়ে যাচ্ছিল মুসলিম হোস্টেলের পেছন দিকের বেশ কিছুটা জমি। জানি না অরুণবাবু কোন অদৃশ্য শক্তি বলে তা উদ্ধার করলেন, শুধু উদ্ধারই করলেন না তৎক্ষণাত ইটের গাঁথুনি দিয়ে Land Demarkation করালেন।

এরপর হাত দিলেন বেশ কয়েকটি পুরনো ঘর (Class Room) ভেঙে দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে খোলামেলা ও বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ তৈরির কাজে। সময়টিকে বেছে নিলেন একটা ছুটিতে। অবশ্য এতে তিনি লালগোলার মানুষের বিরাগভাজন হন। অনেকে দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করেন। যখন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উন্মোচিত করলেন তখন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্যরকম। এমনকি তিনি যে মহেশ নারায়ণ রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন এটাও সকল শিক্ষক শিক্ষিকাও ঠিক মতো জানতেন না। স্বর্গীয় প্রধান শিক্ষক মদন মোহন রায় মহাশয়ের বিদ্যালয় সংস্কার এবং অরুণ কুমার দাস মহাশয়ের বিদ্যালয় সংস্কারের ভাবনা, বাস্তব রূপ দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন। আজ যদি রমেশবাবু, মদনবাবু বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো বলতেন ... না থাক তাদের কথার ভাবনা আমার কলমে না লেখাই শ্রেয়।

বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের জন্য Smart Class, Steam Lab, অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অডিটোরিয়াম কু না তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার ১০০% করাতে পেরেছেন খেলাধূলা N.C.C School Band এবং Cultural Team তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বিদ্যালয়কে এনে দিয়েছেন অনেক অনেক পুরস্কার। আজ এম.এন. একাডেমি জেলা তথা রাজ্যের গর্ব। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেককে অনেক কথা শুনিয়েছেন। শুনে রাগ যে হয়নি তা নয়, তবে পরক্ষণেই তিনি ভালোবেসে কাছে ডেকে নিয়েছেন এটাই তাঁর মহৎগুণ। প্রতিদিনের শুরুতে সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের প্রার্থনার জমায়েত যে মঞ্চের নীচে করেন তার নাম দিয়েছেন "ঐকতান" এর দ্বারা তিনি যেন বলতে চেয়েছেন "একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন" অথবা "আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি"।

— x —

অবসরের পরেও কেন স্কুলে যাই

বিরিঞ্চি কুমার হালদার (প্রাক্তন শিক্ষক)

২০২১ সালের মার্চে লাগগোলা এম.এন. একাডেমি থেকে অবসর নিয়েছি। এখন ২০২৬ সালের মার্চ চলছে। এখনও আমি স্কুলে যাই এবং স্কুলে গিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে। এটাতো স্রোতের বিপরীতে চলা। স্রোতের বিপরীতে চলার কিছু কারণ বা উদ্দেশ্য আছে। যেমন স্কুলে গেলে স্নেহের সহকর্মীবৃন্দ বর্তমান ছাত্র ও দরকারি কাজে আসা প্রাক্তনীদের সাথে দেখা হয়। তাদের সাথে ভাব বিনিময়ে আনন্দে মন ভরে উঠে, প্রশ্বাসে যেন বাড়তি অক্সিজেন পাই। বাড়িতে যেমন ছেলে, মেয়ে, বৌমা, জামাই এর মুখে বাবা বাবা ডাক শুনে মন ভরে যায় তেমনি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মিষ্টি ও মধুর স্যার স্যার ডাক শোনার জন্য মন প্রাণ উতলা হয়ে উঠে। এই স্যার স্যার ডাক থেকে একদিন সমস্ত শিক্ষক সমাজকে দূরে থাকতে হয় বা হবে কিন্তু ছাত্র দরদি শিক্ষক মহাশয়দের কাছে এটি খুব কষ্টকর হয়। স্কুলে আসার জন্য বাড়ির অন্যান্য কাজ নিজের শরীরচর্চা ছাদ বাগানের পরিচর্যা প্রভৃতি কাজগুলো ঠিক ঠিক ভাবে করার জন্য আমাকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, যেটা আমাকে স্বাস্থ্যবান থাকতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে থাকা সময়টা কাজের মধ্যে খুব সুন্দর ভাবে এবং দ্রুত কেটে যায়। এম.এন. একাডেমির প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার দাস মহাশয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুলের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং স্কুল অন্তঃপ্রাণ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়াও অনেক বিদ্যালয় কর্মীর স্কুলের কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং সময় দেওয়া আমার খুব ভালো লাগে। সমাজে এমন মানুষও ছিল বা আছেন যাঁরা দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন দেশের উন্নতি ও সুনামের কথা ভেবে নিজের জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করে চলেছেন, তাঁদের মাথা নত করে প্রণাম করেও শ্রদ্ধা অপূর্ণ থাকে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেন। যেমন আছেন মিথ্যাবাদী প্রতারক, থ্রেটার, দুর্নীতিবাজ। তেমনি আবার সমাজে এমন মানুষের কথা ভেবে এবং সমাজ আমাকে যে সুখটুকু দিয়েছে তা ভেবে নিজের কাছে নিজেকে লজ্জা লাগে। যে সমাজ আমাকে এতকিছু দিল সেই সমাজকে আমি আমার স্বার্থের বাহিরে গিয়ে কী দিলাম? আরও আমি ভাবি তফশীলি জাতি হিসাবে সুবিধা এবং সমাজের কিছু মানুষের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম বলেই এই লেখাপড়াটুকু শিখতে পেরেছি সর্বোপরি এম.এন. একাডেমির কর্তৃপক্ষ আমাকে উদারতা (ডোনেশান ছাড়া) দেখিয়ে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন তাই এই কথাগুলো স্কুল পত্রিকার জন্য লিখতে পারছি, তা নাহলে এখন আমাকে ঘাটে ঘাটে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। যেটা আমার বংশের লোকেরা এখনও করে চলেছেন। তাই অনেক আগে থেকেই ভাবতাম অবসরের পর যদি তেমন সুযোগ পাই সামান্য হলেও বিদ্যালয়ের স্বার্থে কিছু করার চেষ্টা করবো। বিদ্যালয়কে যেটুকু দিতে পেরেছি তার থেকেও বেশি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল বা আছে কিন্তু একটা মানুষ ইচ্ছা থাকলেও সব কিছু করতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে আমি আত্মীয় স্বজন বা কোনও বন্ধুর কাছ থেকে এই কাজের জন্য কোনো উৎসাহ তো পাইনি বরং এই কাজ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তখন আমি মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যদি অবসর ভাতা না পেতাম তা হলে আমাকে দৈহিক পরিশ্রম করেই তো জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। তাই তাদের নিষেধকে গুরুত্ব দিইনি। এটা আমার অহংকার নয়, বলতে পারেন আমার অন্তরের

ইচ্ছা যে আমি একজন স্বাস্থ্যবান নাগরিক হতে চাই, কারণ আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি বা মনে করি যদি সমাজে আমরা সবাই স্বাস্থ্যবান নাগরিক হতে পারি কমপক্ষে আন্তরিকভাবে স্বাস্থ্যবান নাগরিক হওয়ার চেষ্টাও করি তবেই আমাদের সমাজ হবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। আর এই চেষ্টা কিছু কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমার ইচ্ছা সেই কাজে সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। কাজের উদাহরণ জানার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবান কথাটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা। স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা। আর যখন সমাজের সকল নাগরিক দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সুস্থ থাকবেন তখন ঐ সমাজকে বলা যাবে সুস্থ সমাজ। বর্তমান সমাজে ঐ রকম নাগরিকের বড় অভাব। তাই বলা যায় আমাদের সমাজও সুস্থ বা স্বাস্থ্যবান নয়। কিন্তু আমরা সবাই মনে মনে স্বাস্থ্যবান সমাজ চাই। এটা পাওয়া সম্ভব যদি আমরা সবাই দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করি। এখন দেখা যাক দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা কী, কেমনভাবে সেগুলো অর্জন করা যায়।

দৈহিক স্বাস্থ্য

দৈহিকভাবে স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ সুস্থ-সবল এবং রোগ মুক্ত সুন্দর জীবন। এই রকম জীবন তৈরি করতে না পারলে তার দ্বারা সমাজের উন্নতি তো দূরের কথা — তাঁর পরিবারেও উন্নতি হবে না বরং সে, পরিবারের কাছে হবে একটা বোঝা ও অশান্তির কারণ। মানুষের সাধারণত যেসব রোগগুলো হয় তার ৯০-৯৫ ভাগ রোগ থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে যদি নিজেকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, নিয়ম করে খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম নেয়, এবং প্রাত্যহিক কাজ-কর্মগুলো করে আর সামান্য কিছু খালি হাতে ব্যায়াম যোগাসন ও কিছু প্রাণায়াম করে। আর এটাই আমি বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে করার চেষ্টা করছি। আমি প্রকৃত অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। মেডিক্যাল অ্যালাউনস-এর যে টাকাটা খরচ হয়েছে তার বেশির ভাগই আমি সুস্থ কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। তাই বলা যায় ইচ্ছে করলেই নিজেকে সুস্থ রাখা যায়। আর নিজেকে সুস্থ রাখতে পারলে ভালো স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুঁজে কষ্টার্জিত সঞ্চিত টাকা তাদের দান করতে হবে না। ঐ সঞ্চিত টাকা পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। যাতে পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফুটবে।

মানসিক স্বাস্থ্য

সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সব সময়ই নিয়মের উল্টো পথে চলেন, এভাবে চলাটাকে নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। বাড়িতেও কিছু ছেলে-মেয়ে ঠিক এই রকম আচরণ করে বাবা-মার কথা শোনে না, জেদি এবং রাগী হয়। কিছু ছেলে দেরি করে স্কুলে আসে এবং লাস্ট বেঞ্চে বসে। শিক্ষক মহাশয়দের কথা না শুনে নিজেদের মধ্যে গল্প করে। আবার নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার অনুমতি না দিলে এরা চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ভাঙচুর করে, শিক্ষক মহাশয়দের গালিগালাজ করে। এরাই বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা অন্য কারো স্বার্থে সমাজের মূল্যবান সম্পদকে ধ্বংস করে। এরা সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ বা দুর্বল মানসিকস্বাস্থ্য সম্পন্ন। এদের সংখ্যা সমাজে যত বাড়বে সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের বেঁচে থাকার সুখ বা আনন্দ তত হারাতে থাকবে।

এদের সংখ্যা কমাতে আমাদের এই সব মানুষদেরকে প্রশয় দেওয়া বা তাদের ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগান বন্ধ করতে হবে। এদের প্রতি উদাসিনতার মানসিকতা ত্যাগ করে একেবারে শৈশব বা কিশোর অবস্থা থেকেই তারা যেন অসুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন শিশুতে বা কিশোরে পরিণত না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রথমে এই শিশু কিশোরদের আদর ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের মন জয় করে তাদের কাছে আমাদেরকে আপনজন বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। তাহলেই তারা আমাদের নির্দেশ মতো চলার পথ বেছে নেবে। এছাড়া পড়াশোনার সাথে সাথেই এই কাজগুলো তাদের অভ্যাস করাতে পারি যেমন — (১) গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা, (২) বেতার-নাটক শোনা, নাটক দেখা ও নাটকে অভিনয় করা, (৩) হারমোনিয়ামের সঙ্গে গান গাওয়া, (৪) বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র বাজাতে শেখা, (৫) নাচ শেখা, (৬) ছবি আঁকা শেখা ও সুন্দর হাতের লেখার জন্য নিয়মিত অভ্যাস করা, (৭) গাছের চারা লাগান এবং তার নিয়মিত যত্ন নেওয়া, (৮) বিভিন্ন ধরনের ধ্যানাসন নিয়মিত অভ্যাস করা, (৯) সমাজের মঙ্গলকর উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করান, (১০) মানুষের বিপদে এককভাবে বা টিম করে সাহায্য করার অভ্যাস তৈরি করা, এছাড়াও (১১) কিছু ইন্ডোর গেম আছে যেগুলো স্কুলে বা বাড়িতে খেলার চর্চা করলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হবেই। এককথায় বিভিন্ন কাজের মধ্যে সব সময়ই নিযুক্ত থাকতে হবে বা রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের চঞ্চল মন বসে থাকবে। আর সমাজ আতঙ্ক মুক্ত হয়ে সুখী সমাজে পরিণত হবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য

যখন সমাজের সকল নাগরিক দৈহিকভাবে সুস্থ সবল এবং পজিটিভ মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে যে কর্তব্য, দায়িত্ব বা পেশাতে যুক্ত থাকুন না কেন তা সে সঠিকভাবে পালন করলে তখনই সেই সমাজ একটা স্বাস্থ্যবান সমাজে পরিণত হবে। সুস্থ বা স্বাস্থ্যবান সমাজ কেমন হবে তার একটি নমুনা বা চিত্র তুলে ধরছি।

যদি এমন হয় কোনো এক গভীর রাতে এক সন্তান সম্ভবা রোগীকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হল। তখন ঐ রোগীর স্বামী অথবা বাবা অ্যাম্বুল্যান্স কল করল। সাথে সাথে ড্রাইভার অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে বাড়ির গেটে হাজির। রোগী অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে হসপিটালের দিকে চলল। রাস্তা এত মসৃণ ছিল যে ঐ রোগীর গাড়িতে যেতে কোনো কষ্টই হল না। রাস্তা এবং রাস্তার পাশে পাথর বালি বা অন্যকোনো নোংরা আবর্জনা নেই, নেই কোনো গন্ধ, পথবাতি যেন রাস্তাকে দিনের মতই উজ্জ্বল করে রেখেছে, পথে ছিনতাইবাজ বা ডাকাতের কোনো উৎপাত ছিল না এভাবে তারা হসপিটালে পৌছল। সেখানে তারা দেখলেন ডাক্তারবাবু নার্স অন্যান্য কর্মী সব পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। মুহূর্তের মধ্যেই রোগী ডেলিভারি রুমে পৌছে গেল। সকালে জানা গেল কন্যা সন্তান হয়েছে, বাড়িতে কি আনন্দ প্রতিবেশীদের একপ্রস্থ মিষ্টি মুখ হয়ে গেল।

এক দিন পর মা মেয়ে বাড়িতে এল। দু-দিন পরে মেয়ের বাবা হসপিটালে গেলেন এবং অফিসারের কাছ থেকে জন্মের প্রাথমিক কাগজ-পত্র নিয়ে এলেন। ঐ অফিসার শিশু জন্মের দিনই তার কাগজ তৈরি করে রেখেছিলেন। তারপর পঞ্চায়েতে গিয়ে সেই কাগজ দেখালেন, পঞ্চায়েতের অফিসার কিছু সময়ের মধ্যেই তাঁকে শিশুর জন্ম সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে দিয়ে দিলেন। এদিকে শিশু শুধু বাবা-মাই নয় ঠাকুরমা ঠাকুরদা পিসি মাসি এবং প্রতিবেশীর আদর খেয়ে বড়ো হতে থাকল।

একদিন সেই মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। মেয়ে খুব

আনন্দিত মনে প্রতিদিন সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যেতে লাগল। হঠাৎই একদিন মেয়েকে ডেকে তার বাবা জিজ্ঞেস করল কিরে মা তোর নতুন স্কুল কেমন লাগছে? মেয়ে তখন আনন্দে চিৎকার করে বলল বাবা আমাদের স্কুল দারুণ। কী রকম দারুণ একটু বল না শুনি। মেয়ে বলল আমাদের স্কুলের মাঠে প্রতিদিন ১০-৪০-এ প্রার্থনা হয়। সেখানে আমরা, মাস্টারমশাইরা দিদিমণিরা অফিসের কাকুরা সবাই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াই এবং একসাথে জাতীয় সঙ্গীত গাই। কী ভালো যে লাগে তখন। জান বাবা, প্রার্থনার সময় স্কুলের এক জনকেও ঘরে বসে থাকতে কোনো দিন দেখিনি। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একেবারে ঠিক সময়ে ক্লাসে চলে আসেন এবং এত ভালোভাবে আমাদের পড়ান যে আমাদের পড়া ক্লাসেই তৈরি হয়ে যায়। হেড স্যার প্রতিদিন ক্লাস চলার সময় ঘুরে বেড়ান আমার মনে হয় উনি দেখেন কোথাও কোনো ছাত্র-ছাত্রী বাহিরে আছে কিনা আমরা ক্লাসে দিদিমণির কথা শুনছি কিনা বা কোন ক্লাসে গন্ডগোল হচ্ছে কিনা। আমাদের হেডমাস্টারমশাই ভীষণ কড়া দুষ্টুমি করলেই খুব বকাঝকা করেন কিন্তু ক্লাসে পড়া পারলে আমাদের খুব আদর করেন। আমাকে কতদিন আদর করেছেন জান বাবা।

এই রকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমাজই হল সুস্থ সমাজ। এই রকম সুস্থ সমাজে বাস করতে আমরা সবাই চাই কিন্তু পাই না বলে আফসোস করি। কিন্তু যদি সমাজের প্রতিটি সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের কর্মচারীগণ সবাই উন্নত দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অর্জন করে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তবে আমাদের সমাজ সত্যিই একদিন স্বাস্থ্যবান হবে এবং আমাদের দেশ বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় ফিনল্যান্ডেলের মতো প্রথমে আসতে না পারলেও ১৩৯-তম স্থান থেকে অনেক নীচে নেমে আসবে।

— x —

লালগোলা এম.এন. একাডেমি ও আমি

অর্ণব রায় (প্রাক্তন ছাত্র)

লালগোলা এম.এন একাডেমিতে আমার ভর্তি হওয়াটা তীব্র শোকের মধ্যে দিয়ে। আমার পৈত্রিক বাড়ি সম্ভবত এই স্কুলের নিকটতম বাড়িগুলোর মধ্যে একটা। অথচ আমার এই স্কুলে পড়ার কথা ছিল না। দীর্ঘ উনিশ বছর লালগোলা থেকে জঙ্গীপুরে নিজের কর্মস্থলে যাতায়াতে করে ক্লান্ত আমার বাবা জঙ্গীপুরে সামগ্রিক বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী স্থির হয়, আমি রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি হব। আমি তখন ক্লাস ফোরের শেষের দিকে। তখন অ্যাডমিশান টেস্ট হত ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়ার জন্য। সেই পরীক্ষার উনিশ দিন আগে আমার বাবা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আধঘন্টার মধ্যে মারা যান। আমাদের জীবন ওলট-পালট হয়ে যায়। জঙ্গীপুরে অসহায় একা আমার মা ও আমাকে রাখতে রাজী ছিলেন না আমার বাড়ির লোক, আমার কাকারা। আমরা ফিরে আসি। আমি ভর্তি হই এম.এন. একাডেমিতে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এই রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে আমি ফিরে আসি ২০০৭ সালে, শিক্ষক হিসেবে এবং দীর্ঘ পনের বছর সেখানে শিক্ষকতা করে ২০২২ সালে সেখান থেকে বদলি হই। যাই হোক।

লালগোলা এম.এন একাডেমিতে আমার পরিবারের সকলেই পড়াশোনা করেছে। পরিচিতি একটা ছিলই। তার ওপর শ্রদ্ধেয় শ্রীরণেনবাবু, শ্রী অশোকবাবু, এঁরা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু, আমাদের পরিবারের অংশ। আমি জ্ঞান হওয়া ইস্তক এঁনাদের আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি। বা আমরাও এনাদের বাড়িতে গেছি। আমার মনে আছে, আমি তখন খুব ছোটো, রণেনবাবু আর অশোকবাবু তখন স্কুলের হোস্টেলে থাকতেন। একদিন আমি রণেনবাবুর ঘরে লাইটার দেখে কৌতুহলবশত জ্বালাতে গিয়ে নাক পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। অনেক ঘটনার মধ্যে কেন যেন আমার এই ঘটনাটা আবছা হলেও মনে থেকে গেছে। রণেনবাবুর বিয়েতেও আমি গেছিলাম ছোটোবেলায়। আশ্চর্যভাবে, সেই বিয়েবাড়ির দু-একটা দৃশ্যও আমার মনে এখনও থেকে গেছে। চাইলেই চোখ বুঁজে দেখতে পাই। রণেনবাবু পরবর্তীকালে আমাদের দিয়ে একটা নাটক করান। সে এক অসাধারণ ব্যাপার। নাটকের নাম, 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে'। সে নাটক যখন আমরা করতে শুরু করি তখন আমরা বোধহয় ক্লাস সেভেনে পড়ি। শেষ শো হয়, তখন ক্লাস নাইনের শেষ দিক বা ক্লাস টেন। প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের অনুষ্ঠানের জন্য যে নাটক করা শুরু হয়েছিল, তার অন্ততঃ গোটা পাঁচ সাতেক শো হয়েছিল। বহরমপুর, বেথুয়াডহরি, কোথায় যাইনি। এই নাটকে আমি এক বুড়ির রোল করেছিলাম। রাজমাতা। আমার ঠাকুমার সাদা থান আর তলায় স্কুলের সাদা জামা আর হাফপ্যান্ট। কেঁজো বুড়ি। বাঁ দিকের উইংস দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে বেঁকে ঢুকতাম। প্রথম ডায়লগ এখনও মনে আছে, 'পারে না পারে না, যে অন্যকে ভাগ দিতে পারে না, সে নিজেও ভোগ করতে পারে না।' কাঁপা কাঁপা গলায় এই ডায়লগ বলতে বলতে স্টেজে ঢুকলে বিস্তর হাততালি পড়ত। তার কারণ অবশ্যই আমার অভিনয় নয়, গোটা নাটকে নারী চরিত্র একটিই ছিল, আর ছেলেতে মেয়ে সাজলে ওরকম উল্লাস একটু আধটু হবেই। তা সে বুড়ি হোক না কেন। মনে রাখতে হবে, আমরা গত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা বলছি। তখন দুনিয়াটাই অন্যরকম ছিল। মানুষের হাতে মনোরঞ্জনের উপকরণ কম ছিল। যাই হোক, সে নাটকে সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ছিল ময়ূরের। সে চরিত্রটি করে আমার বন্ধু প্রদীপ্ত বা

পাপাই। মনে আছে বেথুয়াডহরীতে শো-এর পরে কয়েকটি মেয়ে সাজঘরে এসে পড়েছিল শুধু ময়ূরকে একবার দেখবে বলে। অরিত্র সান্যাল ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। তাকে সেনাপতির চরিত্র দেওয়া হয়। দক্ষিণরায়। তার লম্ফঝম্ফের চোটে স্টেজ ভেঙে পড়বার উপক্রম হতো। আরও ছিল, শেয়াল, জম্বুক, আরও কারা কারা যেন। ক্রমে আমাদের বয়স বেড়ে যায়। বিশেষ করে, বয়ঃসন্ধির প্রভাবে আমার দাড়িগোঁফ বেরিয়ে আসে। কণ্ঠস্বরও মোটা হয়ে যায়। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ম্যাকবেথের উইচ হিসেবে চলে গেলেও, শিশুবোধ্য নাটকে চলে না। তার ওপর বৃদ্ধর সরু গলার ফাঁকে অভিনেতার হেঁড়ে গলা বেড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। কালক্রমে নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের বাড়বৃদ্ধি এর একটু কম দ্রুত হলে রণেনবাবু বোধহয় আর কয়েকটা শো করাতে পারতেন আমাদের দিয়ে।

রণেনবাবু অসাধারণ ছবিও আঁকতেন। আমি অনেক ছোটোবেলায় ওনার কাছে কিছুদিন আঁকা শিখি। ঐ যেরকম শিশুরা একটা বয়সে নিয়ম করে আঁকার ইস্কুলে ভর্তি হয়। রবিবারের সকালে একটা নেড়া ছাদের একধারে নানা বয়সের ছেলে-মেয়ের সাথে বাবু হয়ে বসে, কোলের ওপর পিচবোর্ড, পিচবোর্ডের ওপর ছোটো করে কাটা আর্ট পেপারের ওপর এইট বি পেন্সিল দিয়ে প্রাণপন লাইন সোজা করার চেষ্টা, গাছপালা ঘরবাড়ি আঁকার চেষ্টা। আমার তখনও এম.এন. একাডেমিতে ভর্তি হতে ঢের দেরি। এই বাড়িতেই পরবর্তীকালে আমাদের নাটকের রিহার্সাল হয়। আমাদের ক্লাব নেতাজি সঙ্ঘ-র জন্য উনি নেতাজির একটি বিশাল বড়ো পোট্রেট এঁকে দেন। তাতে নেতাজির সাথে একটা জ্বলন্ত মশাল ও লালকেল্লাও ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল। নেতাজির স্পিরিট এত ভালো ধরতে আমি খুব একটা দেখিনি আর কোথাও। সেই সময় নেতাজি সঙ্ঘের নিজস্ব কোনও ক্লাব ঘর না থাকায় সে ছবি দীর্ঘদিন আমাদের বাড়ির বাইরের বসার ঘরের দেওয়ালে ডাঙানো ছিল। অয়েল পেন্টিং-এর সাথে সেটাই আমার প্রথম পরিচয়। অনেকবার সেই ছবির দিকে আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি, সে স্মৃতি আমার স্পষ্ট হয়ে আছে।

ছবি বিকাশবাবুও আঁকতেন। ওঁনার কাছেও আমি কিছুদিন যাতায়াত করেছি আঁকা শেখার জন্য। বা বলা ভালো আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিকাশবাবুর পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। উনি যে-কোনো একটা বস্তু আমাদের সামনে এনে রেখে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে সেটাকে আঁকতে বলতেন। সেখানে যাওয়াও আমার এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনেক আগে। তবে বিকাশবাবুর শিল্পী মেজাজকে বুঝতে আমাদের অনেকটা বড়ো হতে হয়েছে। পরবর্তীকালে বিকাশবাবুর সাথে আমাদের ঘনিষ্টতা অনেক বেড়ে যায়। বাইরে পড়তে যাওয়ার পরে বাড়ি এলে ওনার বাড়ি মাঝে মাঝে যেতাম। এঁদের কাছে আঁকা শেখার চেষ্টা করেও যে আমার আঁকা কিছুই হয়নি, তার দায় এক এবং একমাত্র আমার। ওনারা গাধা পেটাতে কসুর করেননি।

ছোটোবেলা থেকেই আবৃত্তির প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। কী করে সে ঝোঁক এল তা আজ মনে নেই। তবে স্কুলে কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতা হলেই আমার যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। একবার এরকমই কোনও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কিছু একটা স্থান পেয়ে পুরস্কার হিসেবে পাই, জয় গোস্বামীর 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' ও অরুণ মিত্র-এ 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে' কাব্যগ্রন্থদুটি। সমসাময়িক বাংলা কবিতার সঙ্গে এই আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। সে টান দিনে দিনে প্রগাঢ় হয়েছে। বর্তমানে সে টান অচ্ছেদ্য। খুব সম্ভবত শ্রদ্ধেয় শ্রী অলকবাবু, আমাদের কাছে তিনি তখন শুধুই বন্ধু অরিত্রর বাবা, উনিই বই দুটি পছন্দ করেন। আমার যেটুকু সাহিত্যের প্রতি টান বা লেখালেখির প্রতি আগ্রহ, পরোক্ষ তার বীজ উনিই বপন করে দিয়ে যান। এই সমস্ত

প্রতিযোগিতার জন্য আমাদের প্রস্তুত করাতেন শ্রদ্ধেয় শ্রী রতনবাবু। ওনার প্রচন্ড হাই পাওয়ারের চশমার আড়ালে অতলে হারিয়ে যাওয়া চোখ আজও মনে পড়ে। যে স্নেহ ও প্রশয় ওনার কাছ থেকে পেয়েছি, মনে রয়ে গেছে।

আমাদের কয়েকজনের ইংরেজির উন্নতি করার জন্য শ্রদ্ধেয় চন্দ্রনাথবাবু আমাদের নিজে থেকে বাড়িতে ডেকে সপ্তাহে একদিন টেস্ট পেপার সলভ করাতেন। খুব ভোরে উঠে ওনার দোতলার বারান্দায় বসে টেস্ট পেপার সলভ্ করতাম আমি আর পাপাই। স্যার সেখানে আরও কয়েকজনকে পড়াতেন। স্যার তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর আমরা দ্রুত কাজ সেরে গালে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম। স্যার মাঝে মাঝেই আমাদের ঠেলা দিয়ে ডাকতেন। এখনও কানে বাজে, এই দেখো, এই ছেলেদুটো পড়তে আসে না ঘুমোতে আসে রে!

শ্রদ্ধেয় অশোকবাবু ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার বাবার মৃত্যুতে উনি অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন, কিছুদিন পরে উনি আমাকে আমার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেন ইংরেজি শেখানোর জন্য। আজ দীর্ঘ উনিশ বছর আমি হাইস্কুলে ইংরেজি পড়াচ্ছি, ওনার মত এত ভালো পড়ানোর পদ্ধতি আমি আজ অবধি কোথাও পাইনি। নব্বইয়ের দশকে একটি আবছা মফঃস্বলে বসে উনি আমাকে ইংরেজি শেখানোর জন্য যে পদ্ধতি নেন, অনেক পরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম.এ ক্লাসে গিয়ে সেটাকেই ডাইরেক্ট মেথড হিসেবে জানি। আমি যেটুকু ইংরেজি জানি, তার ভিত্তি উনিই স্থাপন করে দিয়েছিলেন। অথচ, উনি ছিলেন জীববিদ্যার শিক্ষক। তখন এরকমই সব ব্যাপারস্যাপার ছিল। শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবু যে ক্লাসেই আসতেন, সেই বিষয়টিই এত দক্ষতার সাথে পড়াতেন, যে উনি আসলে কোন বিষয়ের শিক্ষক, আমি আজও জানতে পারিনি।

তখন সময় অন্য ছিল। পৃথিবী বোধহয় একটু আস্তে ঘুরত। শিক্ষকরা শেখাতেন, কাগজের ঠোঙাও পড়বে। পৃথিবীটা পাঠ্য ছিল। মোবাইল না থাকায়, শান্ত ছিল। শিক্ষকরা আমাদের হাতে করে গড়তেন। আমরা অজান্তে গঠিত হতাম। এম.এন একাডেমির দিনগুলো নিয়ে বলতে গেলে বিপুলাকার গ্রন্থ হয়ে যাবে। সময়কালের ঠিক ঠিকানা না রেখে কিছু কিছু মুহূর্তমালা তুলে আনার চেষ্টা করলাম। এই নগণ্য প্রাক্তন ছাত্রকে মনে রাখার জন্য, মনে করে কিছু কথা লিখতে বলার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজতা ও শ্রদ্ধা। স্কুলের বর্তমান উন্নতি আমারও গর্বের বিষয়। আমার স্কুল, আমাদের স্কুল আরও এগিয়ে যাক। লাল বাড়িটার মাথা উঁচু আরও উঁচু হয়ে আকাশ ভেদ করুক।

– x –

গৌরবে গাঁথা লালগোলা এম.এন. একাডেমি

স্বপন কুমার সাহা (প্রাক্তন ছাত্র)

আমি লালগোলা এম.এন. একাডেমির একজন প্রাক্তন ছাত্র। এগারোটা বৎসর আমি এই বিদ্যালয়ে গৌরবময় দিনগুলি কাটিয়েছি। শিক্ষকমহাশয়, বন্ধুবান্ধবদের সাহচার্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা সব মিলে সার্বিক শিক্ষা থেকে আমি বঞ্চিত হইনি বলে আমি নিজেকে গর্ববোধ করি।

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লালগোলা ছিল অজ্ঞতায় ভরা এক গ্রাম্য অঞ্চল। দৈবক্রমে লালগোলা শিক্ষার দ্বারা উন্মোচিত হয় উত্তর প্রদেশ থেকে আগত রাজাদের আগমনে। এখানকার সমৃদ্ধির অন্তরালে ছিল তাদের অবদান। রাও রামশঙ্কর রায়, যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন খ্যাতিমান পুরুষ। রাজবাড়ি, অতিথিশালা ও বহু দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাম শংকর। মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় লালগোলার শিবমন্দির ও নারায়ণ মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি সামান্য গৃহস্থ গৃহে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যে লালগোলার স্বর্গীয় জমিদার রাও মহেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হয়েছিলেন। তিনি দানবীর রাজা ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় উন্নতিকল্পে তাঁর দানের হাত প্রশংসার যোগ্য। তার মধ্যে লালগোলার একটি স্কুল গৃহ নির্মাণকল্পে পঁচিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে মহেশনারায়ণ নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় দেশ-বিদেশ থকে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পেল। ১৯২১ সালে যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পাদস্পর্শে বিদ্যালয়ের খ্যাতির ছটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ছিলেন বিরাট যোগী, কর্মযোগী ও গৃহী। ছাত্ররা তাঁহার পাঠদানে মুগ্ধ হয়ে শুনতো। জ্ঞান তপস্বী এই সাধক বিদ্যালয়কে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। ছাত্রদের সর্বাধিক উন্নতির দিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি থাকতো। নিষ্ঠাবান, ছাত্র-পরোপকারী বরদা চরণ ছিলেন লালগোলার গর্ব।

একটা ঘটনা আমাকে পীড়িত করেছিল। আমি ও আমার ভাই একসঙ্গে তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তাম। একদিন গরমের ছুটিতে বন্ধুদের সাথে ভাই স্নানে গেলে নদীতে ডুবে মারা যায়। অকালে ভাইকে হারিয়ে আমি দিশাহারা হয়ে যাই। ভাই বরাবর প্রথম হতো, আমি দ্বিতীয় হতাম। তারপরের বৎসরে ১৯৬৪ সালে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল ভাইয়ের পুরস্কার আনতে গিয়ে আমি চোখের জল সংরক্ষণ করিতে পারিনি। আমাদের সময় প্রধান শিক্ষক মদন মোহন রায় ও সহকারী শিক্ষক মহাশয় রমেশ চন্দ্র রায়, আমার দাদা প্রশান্ত কুমার সাহা বিজ্ঞানের বিভাগের ক্লাশ নিতেন। মদনবাবু অঙ্ক সহজ করল করে বোঝাতেন ও মাঝে মাঝে গল্প করে ছাত্রদের মন জয় করতেন। রমেশবাবু ছিলেন একটু কড়া ধাতের। তিনি বিজ্ঞান বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে পড়াতেন। ছাত্ররা একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর ক্লাসে মনোযোগ সহকারে শুনতেন। কোনো কারণে কোনো কোর্স সময়মতো সম্পন্ন না হলে সকালে অতিরিক্ত ক্লাস করাতেন। ছাত্ররা শিক্ষক মহাশয়ের সাথে পড়াশোনার আলোচনা করতো। তাঁদের শিক্ষাদানের প্রতি নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা আমাদের মুগ্ধ করতো। বরদাচরণবাবুর পুত্র শম্ভুচরণ মজুমদার আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। শিক্ষকের ভূমিকা কেবল শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের নৈতিক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অপরিসীমা প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রদের কাছে তাঁরা আদর্শ ছাত্ররা

তাঁদের দেখেই শেখে, তাঁদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়, ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে বিকশিত করা তাঁদের কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, What the teacher has to do is to make his pupil become aware of his inherent perfection. He says that every child has innate perfection and it is for the teacher to pave the way for child to manifest the innate perfection in him. Swamiji says we want that education by which character is formed, strength of mind is increased the intellect is expanded and by which one can stand on one's am feet. বিদ্যালয় এখন নবরূপ পেয়েছে। সাথে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহত্তর পরিসরে বিদ্যালয় আজ বিদ্যমান। কিন্তু অতীতের ঐতিহ্যের কিছুটা ম্লান চোখে পড়ে। আমি বিদ্যালয়ের সূবর্ণ জয়ন্তী ও শতবার্ষির্কীতে সাক্ষী হতে পেরে গর্বিত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিদ্যালয় হয়ে উঠুক আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র।

– x –

হে অতীত কথা কও

স্বপন কুমার পান্ডে (প্রাক্তন ছাত্র)

সেখালিপুর হাইস্কুলে (তদানীন্তন সেখালিপুর জুনিয়র হাইস্কুল) পড়তে পড়তেই লালগোলা এম.এন.একাডেমির নাম চেনা হয়ে গিয়েছিল। মামারবাড়ির কৌশিক পুরোহিত ছিলেন ফকির পাঁড়ে (ওঁর এছাড়া একটা পোশাকি নাম ছিল - যতদূর মনে পড়ছে সেটা সত্যেন্দ্রনাথ পান্ডে)। ওঁর বাড়ি ছিল স্কুলের ঠিক পিছনে — গা-লাগোয়া। মামাদের বরোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। আর সেই সব উপলক্ষে ফকির পাঁড়ে মামার বাড়িতে যেতেন। রাত্রির পুজো-আচ্চা সেরে রাত্রিবাস করতেন ওখানেই। রীতিমতো মজলিশি লোক ছিলেন উনি। ওঁর কথকতার বেশির ভাগই থাকত অতীত ঘটনার নানা বর্ণনায় ভরা। উনি যখন ওঁর কাহিনী শুরু করতেন — সেই কাহিনির নৌকা সম্ভব অসম্ভবের খাল পেরিয়ে তরতর করে বয়ে যেত। বই-পত্র সরিয়ে রেখে একতান মন হয়ে শুনতাম সেই কথকতা। সেই কথকতার মধ্যেই উঠত লালগোলা হাই স্কুলের কাহিনি। আর তার দাপুটে সব প্রধান শিক্ষকদের কথা। সেই কাহিনীর মধ্যে বহুবার শুনেছি প্রবাদ প্রতিম প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের কথা। ফকির দাদুর কাছ থেকে ছাড়াও আমার ছোটোমামার মুখে একাডেমির কথা শুনেছি। আর তাতেই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল আর এক খ্যাতকীর্তি প্রধানশিক্ষক লোহারামবাবু অর্থাৎ শরদিন্দু ভূষণ পান্ডে মহাশয়ের কথা। এই সব প্রশাসকের ভীতিপ্রদ একটা ছবি আঁকতে তারা পছন্দ করতেন। ফলে তাঁরা সেই সব প্রশাসকের যখন ছবি আঁকতেন তখন তাঁদের অজ্ঞাতসারেই সেই সব বর্ণনার মধ্যে প্রভূত ভীতিদায়ক উপাদান অনুপ্রবেশ লাভ করত। হয়তো সেই সব উপাদান যতটা না অভিজ্ঞতাসঞ্জাত তার চেয়ে বহুলাংশে মনোজগতসঞ্জাত।

প্রধানশিক্ষকদের ক্ষেত্রবিশেষে অনুরূপ সার্থক শিক্ষকদের যে ছবি তাঁদের বর্ণনার ভিত্তিতে আমার মনে একটু একটু করে দানা বাঁধতে লেগেছিল তা আমার কাছে আদৌ স্বস্তিদায়ক ছিল না। ইতিপূর্বে প্রাথমিক এবং জুনিয়র হাই স্কুল শিক্ষা পর্বে যাঁদের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম তাঁদের আর যাই হোক ভয়ানক কিছু বলে মনে হতো না। মনের জিজ্ঞাসা সংশয় বেশির ভাগই তাঁদের সামনে অসংকোচে উন্মোচিত করতে পারতাম।

লালগোলা থেকে মাত্র মাইল তিনের দূরে মাতুলালয়ে থাকার সুবাদে লালগোলা আমার কাছে আদৌ অপরিচিত ছিল না। উপলক্ষে অনুপলক্ষে লালগোলাতে আসতামই। সেই সূত্রে একাডেমির ভবনটিও বাইরে থেকে অনেকবারই দেখেছিলাম। সেই সময়ে সেই বিদ্যালয়ে যখনই চোখ পড়ত সেই শোনা কথাগুলো মনে পড়ে যেত। আর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠত।

এইরকমই এক অবস্থার মধ্যে লালগোলা এম.এন একাডেমিতে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য উপস্থিত হলাম। ভর্তি ব্যাপারটা সেই সময় এখনকার মতো নিয়ম পদ্ধতি-নির্ভর যান্ত্রিক ছিল না। ওটা প্রায় সর্বাংশেই প্রধান শিক্ষকের discretion-এর উপর নির্ভর করত। তখন শ্রী মদনমোহন রায় মহাশয় ছিলেন প্রধানশিক্ষকের দায়িত্বে। ফলে অনিবার্যভাবেই প্রধানশিক্ষকের সামনে পূর্বের স্কুলের মার্কশিট হাতে উপস্থিত হতে হলো। উনি আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমার উত্তর শুনে আমার মার্কশিটের উপর এক কোণে ক্লাসের নামটা লিখে দিলেন। তার আগে আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসলেন মনে হলো।

ওঁকে দেখে মনে হলো — কই, অন্যরকম কিছু তো মনে হচ্ছে না। ইতিপূর্বে শিক্ষকদের যেমন দেখেছি এঁকেও তো সেই রকমই দেখছি। কেবল একেবারে অপরিচিত এই যা। এম.এন. একাডেমিতে যে তিনচার বছর পড়েছিলাম তার মধ্যে তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সাহস করে উঠতে পারিনি। একটা স্বস্তিদায়ক দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি ওঁর সাথে।

প্রথমে এই বিদ্যালয়ের যে দু'জন প্রধানশিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের আমি দেখিনি। কিন্তু মদনবাবুকে দেখেছি ছাত্রাবস্থা থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত। পরবর্তীকালে ওঁকে অনেকটাই কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখেছি আমরা দূরে দূরে থাকলেও উনি কিন্তু আমাদের বেশীরভাগ ছাত্রদেরই চিনতেন — একেবারে নাড়ীনক্ষত্র সমেত।

প্রধানশিক্ষক মদনবাবুর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম। উনি তো ছিলেন গণিতের শিক্ষক। কিন্তু আমাদের ক্লাস টেন-এ ইংরেজির একটা ক্লাস উনি নিয়মিতই নিতেন। লক্ষ্য করতাম একটা মাঝারি মাপের বাঁধানো বই ক্লাসে আসার সময় ওঁর সঙ্গে থাকত। দেখতে দেখতে একদিন জিজ্ঞাসাই করা গেল — বইটা কী বই। উনি বলতেন ডিক্‌সনারি। ক্লাসে ডিক্‌সনারি? কেন? উনি জানালেন উনি তো ইংরেজি পড়াতে এসেছেন। সেই সময়ে হঠাৎ যদি একটা শব্দের অর্থ জানার প্রয়োজন হয় — তখন? শিক্ষকমশাইদেরও যে না জানা বিষয় থাকতে পারে, পারে কেন — থাকেই। সেই স্বাভাবিক সত্যকে যদি কোনো শিক্ষক গোপন করতে চান তাহলে তাঁকে গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হবে। স্যার এটা নিতে চাননি। শিক্ষক শ্রী রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছ থেকেও এই রকমই শুনেছিলাম একদিন। স্যারদের এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে।

স্কুলে শিক্ষকমশাইরা তখন ধুতি পরেই আসতেন। বেশীর ভাগ। মদনবাবুও তাই পরতেন। আর পরতেন কলার দেওয়া পাঞ্জাবি। দুটো ঝরণা কলম তাঁর কাছে থাকত। একটা লাল কালির আর একটা নীল বা কালো কালির। কিন্তু সেই কলম তিনি কখনও বুক পকেটে গুঁজতেন না। গুঁজতেন পাশ পকেটে।

স্কুলে ভরতি হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিরাট এক সমারোহ উপস্থিত হল। সেটি হল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ। একাধিক দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়েছিল। তারমধ্যে একদিন ছাত্র শিক্ষকদের সমিলিত একটি নাটক ছিল। সেই নাটকে এক পণ্ডিতমশাই-এর একটি চরিত্র ছিল। পণ্ডিত মশাই-এর শাসনে অতিষ্ঠ ছাত্ররা তাঁকে জব্দ করার এক ফন্দি আঁটল। কতকগুলো অর্থহীন এলোমেলো শব্দগুচ্ছকে সংস্কৃত শ্লোকের আকারে সাজিয়ে তারা নিয়ে এল পণ্ডিতমশাই-এর কাছে তার অর্থ করে দেওয়ার জন্যে। তিনি দুর্বোধ্য সেই শ্লোক পেয়ে প্রথমে চমকে গেলেন। কিন্তু ছাত্রদের কাছে ছোটো হওয়ার আশঙ্কায় তার মধ্য থেকে অর্থ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্থ কিছুতেই আসে না। উদ্বিগ্ন মনে অর্থ খোঁজার তাগিদে স্কুল যাওয়া বন্ধ হল। উদ্বিগ্ন মনে অর্থ খোঁজার তাগিদে স্কুল যাওয়া বন্ধ হল। নাওয়া খাওয়া উঠল শিকেয়। সঙ্গী থাকল শুধু সামনে রাশি রাশি পুঁথি আর নস্যির ডিবে। যে ছেলেরা পণ্ডিতমশাইকে সেই শ্লোক দিয়েছিল তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম দিকে তারা তত গা করেনি। কিন্তু পণ্ডিতমশাই-এর অবস্থার কথা তাদের কানে উঠল এক সময়ে। তাদের সেই রসিকতার পরিণাম যে এই রকম মর্মান্তিক এক অবস্থার সৃষ্টি করবে তারা তা চিন্তা করেনি। কালবিলম্ব না করে তারা পণ্ডিতমশাই-এর বাড়ি এল। পণ্ডিতমশাই তখন স্নানাগার বর্জিত বিধ্বস্ত অবস্থায় উন্মাদের মতো পুঁথির পাতা খুঁজে চলেছেন। এই দৃশ্য দেখে ছাত্রদের মন মুহূর্তে অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে গেল। শিক্ষকের গুরুর পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে তারা ক্ষমাপ্রার্থী হল। সেই পণ্ডিতমশাই-এর চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন শিক্ষক শ্রী জীবন বোস মহাশয়। নাটক শেষ

হলে সেদিন অনেক দর্শকের চোখেই জল দেখা গিয়েছিল।

শিক্ষক হিসাবে জীবনবাবু বিশেষ 'পপুলার' ছিলেন। উনি আমাদের পড়াতেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। থাকতেন হস্টেলে। একবারের কথা মনে আছে। দিনটা ছিল ছুটির দিন। আমাদের একটা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছিলেন তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করে স্কুল ঘরেই। স্কুলের যে-কোনো ধরনের অনুষ্ঠানে উনি বক্তব্য রাখতেনই। পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটা বিকাশবাবুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি।

শ্রদ্ধেয় শম্ভুচরণ মজুমদারকে পেয়েছি ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে। সেই সময়ে নবমশ্রেণি থেকে ইংরেজির নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছিল না। দু'শ নম্বরই ছিল 'আনসীন'। ফলে শিক্ষকমশাইরা এমনই পড়া আর লেখার ব্যাপারে জোর দিতেন। শম্ভুবাবু নিয়মিত ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ার পরামর্শ দিতেন। মাঝে মধ্যে আমাদের কারও অবস্থা যদি তাঁর কাছে হতাশাজনক বলে মনে হতো, তিনি বলতেন — 'নাঃ, তোমাদের দেখছি দু'কেজি খবরের কাগজ পড়তেই হবে।' বলাবাহুল্য আমাদের দুরবস্থার তারতম্যে সংবাদপত্রের ওজনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত।

শ্রী দিবাকর ঘোষ মহাশয় আমাদের বাংলা পড়াতেন। উচ্চ কণ্ঠে পড়াতেন। শ্রেণিকক্ষের শব্দসমুদ্রে কণ্ঠস্বরকে কখনই ডুবতে দিতেন না। তখন সেভাবে বুঝতাম না। কিন্তু এখন মনে পড়ে পাঠ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচকদের মত উদ্ধৃত করতেন। ওঁকে স্কুলের যে-কোনো অনুষ্ঠানেই বক্তা হিসাবে দেখতাম।

প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় এলেন আমি পড়াকালীনই। উনি ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। আমার ইতিহাস ছিল না। ফলে ওঁর ক্লাস করার সুযোগ আমার হয়নি বললেই চলে। একবার — তখন ইলেভেনে পড়ি। শেষের দিকের একটি পিরিয়ডে ইংরেজি ট্র্যানশ্লেসনের একটা প্রভিসনাল ক্লাসে এলেন। পি.কে. দে সরকারের গ্রামার বই থেকে ট্র্যানশ্লেশন অভ্যাস করতাম আমরা।

সেদিন ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের একটি অংশ ছিল প্রভাতবাবু প্রথমে অংশটি পড়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন — "তোমরা পড়েছ এই গল্পটি?" সমস্বরে উত্তর এল 'না স্যার।' শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুরোধে উনি "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে শশীভূষণ গিরিবালার কাহিনী বলা শুরু করলেন। গল্পের বিষয়বস্তুর গুণে কী ওঁর বলার অনবদ্য ভঙ্গীর জন্য জানি না গল্পটা শুনে কীরকম একটি সম্মোহিত অবস্থা হয়েছিল আমার। সেই স্মৃতি স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ গল্পটি যখনই পড়েছি এই ঘটনার কথা অনিবার্যভাবে মনে এসেছে।

শিক্ষকমশাইদের পড়ানোর ভালো-মন্দ বিচার করার পরিপক্বতা তখন ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে শিক্ষকদের কিছু কিছু কথা কিছু কিছু আচরণ পরবর্তীকালে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। রমেশবাবু শ্রী রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। অঙ্ক ক্লাসেও তাঁকে পেয়েছি। তখন আমার ধারণা ছিল শিক্ষকমশাইদের কাছে পড়ানো ব্যাপারটা খুবই সহজ আর সাধারণ ব্যাপার। ওঁরা ওঁদের অধীত বিদ্যাকেই নিশ্চিন্তে এবং বিনা পরিশ্রমে বারবার ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু রমেশবাবুর কাছেই প্রথম তিনি ক্লাসে কোনো বিষয় ঠিক মতো পড়াতে গেলে সে যে ক্লাসই হোক — বাড়িতে বিষয়টি পড়তে হয় এবং অনুধ্যান করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি পড়তে হয় এবং অনুধ্যান করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই রমেশবাবুর কথার যথার্থ অনুধাবন করতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যখন ক্লাস নাইন-এ পড়ি বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক আমাদের কোনও একটা ক্লাসে দিনকয় এসেছিলেন।

ক্লাসটা থাকত দিনের একেবারে শেষের দিকের হয় শেষ ক্লাস বা তার আগের ক্লাস। যতদূর মনে পড়ছে ওঁর নাম ছিল পার্থবাবু। উনি এম.এন. একাডেমিতে অল্প দিনই ছিলেন। উনি যে যে বিষয়ের ক্লাসে আসতেন তাতে উনি কী পড়িয়েছিলেন তা ভুলতে বিশেষ দেরি হয়নি। তবে ঐ ক্লাসে অন্য একটা ব্যাপার মনে গেঁথে আছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থার কথা উনি বলেছিলেন। শাসনের ঘেরাটোপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পাঠশালা শিক্ষাপর্বের কথা রবীন্দ্র কবিতার লাগসই উদ্ধৃতি সহযোগে বলেছিলেন উনি। আমাদের অনুরোধক্রমে ক্লাসের পড়া হয়ে গেলে শেষের দিকের কিছুটা সময় তিনি এইরকম বলতেন। একাগ্র হয়ে শুনতাম রবীন্দ্রনাথের কথা। এই ক্লাসেরই কোনো এক দিনে তাঁর মুখ থেকে শোনা —

নদী পারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে।

এই লাইনটার কথা ভুলতে পারিনি। 'কথা ও কাহিনী'-র 'স্পর্শমণি' কবিতা পড়তে পড়তে এই জায়গাতে এসে এই ঘটনার কথা মনে পড়ত।

আমি ভর্তি হওয়ার প্রথম দিকে বাংলা পড়াতেন সুকুমারবাবু, আর একজন ম্যাডাম — নাম সম্ভবত রেখা চ্যাটার্জী। ম্যাডাম কিছু দিন পরেই চলে যান। দিবাকরবাবুও বাংলা পড়াতেন। ওঁদের পড়ানোর মধ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটত। সে-সব বিস্তৃতির রসগ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি তখন আমার ছিল না। ইংরেজি পড়াতেন নীরেনবাবু আর শম্ভুবাবু। নীরেনবাবু অন্য স্কুলে চলে যান। মনে পড়ছে তখন কোনো স্কুলের অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে গান গাইতেন নীরেনবাবু। ওঁর পরে বিকাশবাবু আর অলোকবাবু ঐ অভাব পূরণ করেছিলেন। নীরেনবাবুর পর নিলয়বাবু আমাদের কাছে ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হন। আমাদের ক্লাস টেন-এর ক্লাসটিচার ছিলেন শান্তিবাবু। টেন-এ উনি আমাদের অঙ্ক করাতেন। রাশভারি লোক ছিলেন। স্কুলের অনুষ্ঠানে না হলেও অন্যত্র অন্য রকমের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে দেখেছি ওঁকে।

মনে পড়ে পণ্ডিতমশাই ধর্মদাস চ্যাটার্জির মশাই-এর কথা। ক্লাস এইট পর্যন্ত সংস্কৃত পড়াতেন। হঠাৎ একদিন নাইন-এ ইংরেজির ক্লাসে মেক্-শিফ্ট-এ চলে এলেন। সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পড়িয়ে ক্লাসটা সম্পূর্ণ করে তারপরে গেলেন উনি। অমরবাবু আমাদের পড়াতেন তর্ক-বিজ্ঞান। শিক্ষক হিসাবে সুনাম ছিল তাঁর। আমার মনে হতো প্রায় ছাত্রকে নামে তো চিনতেনই, রোল নম্বরেও চিনতেন। বাংলার কিছু ক্লাস নিতেন গোপালবাবু। আর আমাদের ভূগোলের ক্লাসের উনিই ছিলেন একমাত্র শিক্ষক। ভূগোলের অঙ্ক আর মানচিত্র অঙ্কন যত্ন করেই করাতেন উনি।

নিরঞ্জনবাবুর নিয়মিত ক্লাস আমাদের ছিল বলে মনে পড়ছে না। তবে অনিয়মিতভাবে আমরা ওঁর ক্লাস পেয়েছি বেশ কিছু। উনি সধারণত আমাদের ইংরেজির ক্লাসে যেতেন। শিক্ষকমশাইদের অনেকের সঙ্গেই ক্লাসের বাইরেও সম্পর্ক ছিল। একবার আমি কোনো এক ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। সঙ্গে নিরঞ্জনবাবুও চলেছেন। নামব বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে। বহরমপুরে নেমে স্ট্যান্ড লক্ষ করে কোনাকুনি পথ ধরলাম। আমার সঙ্গে ছিল একটা সুটকেস। বই ছিল তাতে। যে কারণে ভারি ছিল বেশ। নিরঞ্জনবাবু সঙ্গেই যাচ্ছেন। আমার সারা শরীর তখন ঘেমে উঠেছে। উনি প্রথমটা আমার দিকে লক্ষ্য করেননি। তবে একসময় আমার দিকে নজর পড়তেই উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আরে দে, আমাকে দে স্যুটকেসটা। আমি প্রথমটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে শেষে স্যুটকেসটি তুলেই দিলাম উনার হাতে নিরুপায় হয়ে। উনি ওটা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় নিজের কাঁধে নিয়ে

নিলেন। পথ চলতে লাগলেন - সঙ্গে কথা ও চলন আগের মতো। যেন কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এটা। কী বলব এই সম্পর্ককে? গুরু শিষ্যের সম্পর্ক? পিতা-পুত্রের নিঃস্বার্থ অপার্থিব ভালোবাসার সম্পর্ক? জানি না। কিন্তু পেয়েছি। স্মৃতির মণিকোঠায় কোহিনুর হয়ে আছে এই সব স্মৃতি।

আমরা বিদ্যালয়ের একটি বিরল ঘটনার সাক্ষী। সেটা হল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন। ১৯৬৪ সালে হয়েছিল আমরা তখন একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। অনুষ্ঠানের অর্থসংগ্রহের জন্য প্রধান শিক্ষক মদনবাবু, সহশিক্ষক রমেশবাবু আর মৌলভিসাহেবকে সাইকেলে করে ঘুরতে দেখেছি। তিন দিন ধরে নানারকম অনুষ্ঠান করেছি। এই অনুষ্ঠানেই প্রথম দেখি রেজাউল করিম মহাশয়কে। ওঁর একটা রচনা অংশ তখন একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্য ছিল। মনে আছে অনুষ্ঠানের মধ্যে বাদলের একটা দুর্যোগ হয়ে অনুষ্ঠানে কিছু বিঘ্ন ঘটিয়েছিল।

এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত মাস্টারমশাইদের মধ্যে অনেকেই আজ আর ইহজগতে নেই। আর সেদিনের সেই ছাপ আজ ছাত্র জীবন শেষ করে কর্মজীবন সমাপ্ত করে অন্যতর এক জীবনের হাতছানির অপেক্ষায় দিন গুনছে। আর পিছন ফিরে তাকিয়ে ভাবছে - 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

– x –

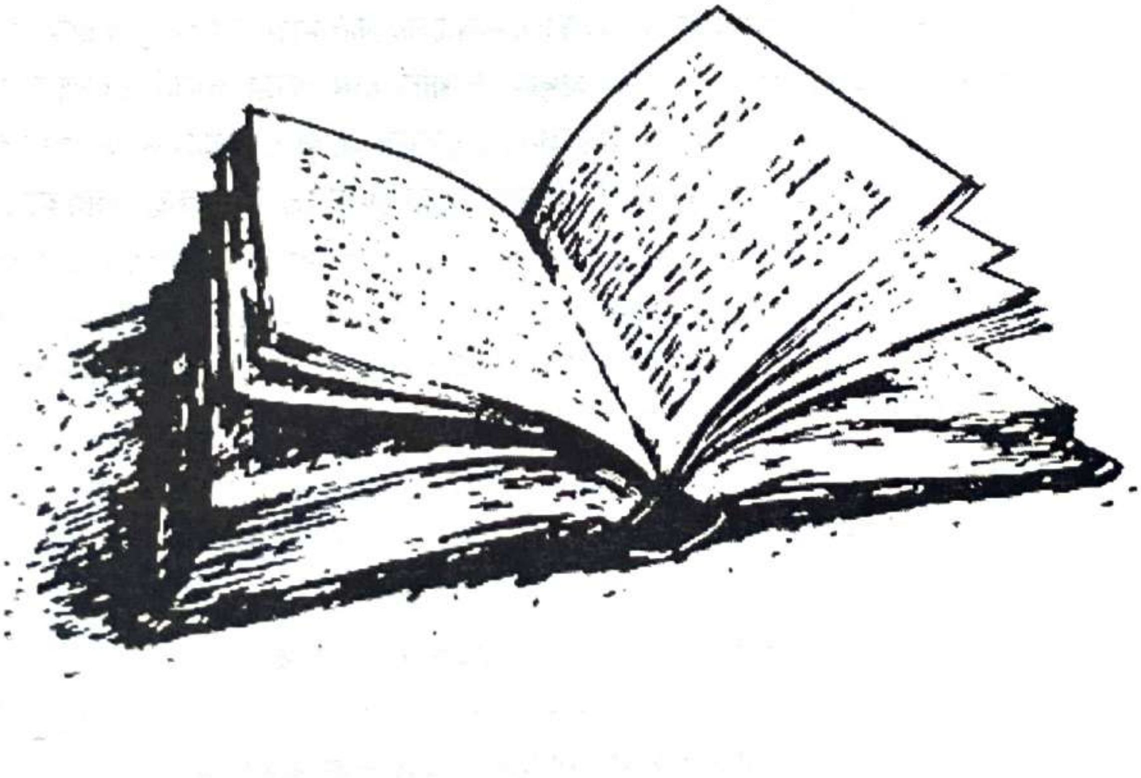

আমার স্মৃতিতে এম.এন একাডেমি

জীবনকুমার বসু (প্রাক্তন শিক্ষক)

নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে বর্গির হাঙ্গামার সময় ১৭৪০-৪২ সাল নাগাদ আমাদের পূর্বপুরুষেরা হুগলী জেলা থেকে পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলায় চলে যান। তাঁদের একজন বিবাহ সূত্রে ফুলতলা থানার আলকা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে ফুলতলা খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই আলকা গ্রামে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর আমার জন্ম। ফুলতলা ছিল বড়ো গঞ্জ। প্রতি বুধ ও রবিবার হাট বসত। এই হাট ছিল খুলনা ও যশোহর জেলার বৃহত্তম হাট। দু'মাইল দূরে রেল স্টেশন, অদূরে ভৈরব নদ, খুলনা-যশোহর রাজপথ ও ৭ মাইল দূরে বিখ্যাত কলেজ দৌলতপুর হিন্দু এ্যাকাডেমি (বর্তমানে দৌলতপুর এ্যাকাডেমি)। ফুলতলায় উচ্চমানের হাই স্কুল ছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমাদেরই বংশের দ্বারকানাথ বসু। আমার ছোটো ঠাকুরদা যামিনীমোহন বসু ১৯০৫-০৯ ও পুনরায় ১৯৪৯-৫০ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: সত্যেন সেন ও আমার জ্যাঠামশায়, ১৯২৫ সালে আমার পিতা ও ১৯২৬ সালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত স্বাধীন হল। খুলনা-যশোহরের বাসিন্দা আমরাও আনন্দে আত্মহারা – তার ঠিক ৩ দিন পরে খবর এল যশোহর ও খুলনা জেলা মুর্শিদাবাদের বিনিময়ে পাকিস্তনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে আমরা ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বহরমপুরে চলে আসি। আমাদের নতুন পরিচয় হল উদ্বাস্তু। ঐ বছরই মে মাসের প্রথমে আমার ডান পায়ে একটি জটিল অস্ত্রপ্রচারের জন্য বহরমপুর হাসপাতালে প্রায় ৪০ দিন থাকতে হয়েছিল। সে সময় ঐ হাসপাতালের খুব খ্যাতি ছিল। আমার ঘরে মালদা, বীরভূমের রোগীও ছিলেন। এখানে উন্নত মানের চিকিৎসা হতো। শুনতাম এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়। তখন বুঝিনি এই নামের সঙ্গে তাঁর বংশধরের সঙ্গে একদিন নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত। নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই বহরমপুর শহরের গ্রান্ট হল — মহারাজা নির্মিত যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনীতে যাতায়াত। অসংখ্য মিটিংয়ে শ্রোতা হিসাবে, বক্তা হিসাবে যোগদান করেছি, একাধিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান দখল করেছি। এইভাবে লালগোলার সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে বাবার সঙ্গে কয়েক ঘন্টার জন্য লালগোলায় গিয়েছিলাম - বাবা প্রধান শিক্ষক সুধীর মুখোপাধ্যায়র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন – সেই প্রথম লালগোলা ও মহেশ নারায়ণ একাডেমি দর্শন। দীর্ঘকাল পর অধ্যাপিকা ড: সতী দত্তের দৌলতপুর কলেজের উপর মুদ্রিত গবেষণা গ্রন্থ পড়তে গিয়ে দাতাদের তালিকায় মুর্শিদাবাদের দু'জন মহারাজার নাম পেয়েছিলাম। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর চেয়ে কিছু বেশি অর্থ দিয়েছিলেন মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়। ১৯৫৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধান চন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডা: শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রস্তাবিত বঙ্গ বিহার সংযুক্তি করণের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন হয়েছিল তার অঙ্গ হিসাবে ১৬ মার্চ আমরা ছয়জন ছাত্র ও ছাত্রনেতা আইন অমান্য করে একমাস কারাদন্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে পরিচয় হয় লালগোলার গঙ্গা দাস রায় চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় ও অজিত পন্ডের সঙ্গে। এই তিন জনের সঙ্গে এঁদের জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত আমার নিকট সম্পর্ক বজায় ছিল।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এম.এন এ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে আমার বন্ধু দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ভোলানাথ চক্রবর্তী ও আমি যোগদান করে পক্ষে-বিপক্ষে তিনজনই প্রথম হয়েছিলাম। বি.এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পর বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী মদন মোহন রায়, শিক্ষক শ্রী দীপেন বাগচীর মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি ঐদিনই অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ে যোগদান করি। দিনটি ছিল ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। প্রথম দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত উপাচার্য খ্যাতনামা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা: সুবোধ মিত্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায়। পরদিন নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিলয় রায় আমাকে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। পরের দিন থেকে আমি একাদশ শ্রেণির (সাহিত্য) শ্রেণি শিক্ষক। প্রথম দুইদিন আমি ৪০ মিনিট ধরে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। পরের দিন থেকে শুরু হয় পাঠদান। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। দীর্ঘদিন শিক্ষক না থাকাতে সব চাইতে ক্ষতি হয়েছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের। পুজোর ছুটিতে ১৫ দিন ও টেস্ট পরীক্ষার পর ১ মাস বিশেষ ক্লাস নিয়েছিলাম। এগুলি ছিল সপ্তাহে ২৯টি ক্লাসের অতিরিক্ত। বিদ্যালয়ে যোগদানের সময় আমি একটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলাম। আমার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ছিল। এই বিদ্যালয়ে অভ্যাসটি আরও দৃঢ় হয়। প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টুদা (বিষ্ণুপদ দাস) খাতা, চক্ ডাস্টার নিয়ে প্রস্তুত। প্রথম ও পঞ্চম ঘন্টায় দ্রুত নিজ নিজ ক্লাসে যাওয়ার সু-অভ্যাস এই বিদ্যালয় থেকেই রপ্ত করেছিলাম। একদিন বিদ্যালয় শুরুর ঘন্টা পড়ার পর খাতা-চক-ডাস্টার নিয়ে বেরিয়ে একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলেছিলাম - মদনবাবু তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে ক্লাসে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি একটু আঘাত পেয়েছিলাম। দীর্ঘদিন পর আমি কলকাতার একটি দরিদ্র এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে যাই। সবাই সেখানে রাজনীতি সচেতন। কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র নেতা শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসরণ করে অন্যান্যরাও গল্প গুজব করে ঘন্টা পড়ার ১০-১২ মিনিট পরে ধীরে সুস্থে ক্লাসে যেতেন। অথচ তখন (১৯৮৩) পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পারিবারিক পেনশন বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা চালু হয়েছে। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীসহ সকল প্রকার সরকারি আধা-সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাৎসরিক পরীক্ষার খাতা দেখা হয়ে যাবার পর নির্ধারিত দিনে বেলা ১টা নাগাদ বিদ্যালয়ের ভেতর ছোটো মাঠে সতরঞ্জি পেতে বিষ্টুদা খাতা এনে দিতেন Scrutiny করার জন্য — সে এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে আমার খুব কাজে লেগেছিল। মাধ্যমিকের ইতিহাস, উচ্চ মাধ্যমিকের (একাদশ) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান, ও উচ্চ মাধ্যমিকের (দ্বাদশ) অর্থনীতি পরীক্ষার খাতা Scrutiny করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিখ্যাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ঐ বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ও টেস্ট পরীক্ষার খাতা Scrutiny করা হতো না। আমি Scrutiny করার কথা বলাতে অনেকে আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। একজন প্রবীণ শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন আমি Scrutiny করার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে বিবাদ বাধাবার ব্যবস্থা

করছি। কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন — তিনি যাঁর ভুল ধরবেন তিনি নাকি ক্ষুব্ধ হবেন। একই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতার স্কুলে। ওখানেও Scrutiny করার রেওয়াজ ছিল না। ফলে আমাকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এম.এন. এ্যাকাডেমিতে ২ বৎসর কাজ করার সুবাদে সুঅভ্যাসগুলি রপ্ত করেছিলাম তা আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে সাফল্য লাভের সহায়ক হয়েছিল। চন্দননগর সরকার মহাবিদ্যালয়ে ১৬ বসরের অধিক কাল রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আংশিক সময়ের শিক্ষক ছিলাম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলাম, কিন্তু সময়াভাবে Scrutiny এর দায়িত্ব নিতে পারিনি।

তখনকার লালগোলার পরিবেশ ছিল সুন্দর। গ্রামের স্নিগ্ধতার সঙ্গে সেই সময়কার শহর জীবনের সুযোগ সুবিধা সবই ছিল। বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ, উন্নতমানের পাঠাগার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হতো। ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যালয়ে অন্তত তিনটি নাটক অভিনয় করেছিলাম। লালগোলায় আমরা টিকিট বিক্রয় করে জোছন দস্তিদারের বিখ্যাত নাটক "দুই মহল" অভিনয় করেছিলাম। পরিচালক ছিলেন শিবু সান্যাল ও জীবন বসু। প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে আমি ও মনোজ সরকার এখনও আছি। অমল কর্মকার, নীরেন ঘোষ অজয় দাস, ও শিবু সান্যল প্রয়াত। লালগোলায় স্বল্পকালীন অবস্থানকালে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি তা এযুগে বিরল। ছুটির দিনে দীপেন বাগচী, অমর মজুমদার ও আমি সাহাবাদ, কালমেঘা প্রভৃতি গ্রামে বেড়াতে যেতাম। এমনি একদিন বেড়িয়ে ফিরছি, দেখি পোস্ট অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত। খোঁজ নিয়ে জানলাম মুখ্যমন্ত্রী বিধনচন্দ্র রায় প্রয়াত হয়েছেন। মন খারাপ হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি তখন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকতেন না। মনে পড়ল একবার বিধান পরিষদে বিতর্কের কথা। RSP নেতা যতীন চক্রবর্তী বাজেট বক্তৃতায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করার পর আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন "এই ডাক্তারের হাতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ শেষ হয়ে গেল।" জবাবী ভাষণে যতীন চক্রবর্তী প্রসঙ্গে ডা: রায় বলেছিলেন "জ্যাকী (যতীন চক্রবর্তীর ডাক নাম) আমার সম্পর্কে বলেছে — আমার মতো ডাক্তারের হাতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ শেষ হয়ে গেল - আমি শুধু অপনাদের জানাতে চাই জ্যাকী — কিন্তু নিজের অসুখ হলে আমার কাছেই আসে।" যাইহোক, খাওয়ার পর মদনবাবুর বাড়িতে গেলাম রেডিও শুনতে। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের ধারা বিবরণী শুনতে শুনতে আবেগ তাড়িত হয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। পরের দিন বিদ্যালয়ে মদনবাবু ঘটনাটি বললে শিক্ষক শান্তিগোপাল দাস আমাকে বলেছিলেন - "বিধান রায়ের মৃত্যুতে আপনি কাঁদছেন — তাহলে ত্রিদিব চৌধুরীর মৃত্যু হলে কী করবেন?"

শিক্ষক প্রয়াত কালীপদ দাসের কথা মনে পড়ে। হোস্টেলে আমার ঘরের পাশে দুখানা ঘর নিয়ে সপরিবারে থাকতেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও ৩টি শিশু সন্তানসহ তাঁর পরিবার। আমার বাবার চেয়ে ৮ বৎসরের বড়ো ছিলেন। বিদ্যালয়ের বাইরে আমি তাঁকে জ্যাঠামশায় বলে ডাকতাম। তাঁর নেতাজী ভক্তি ছিল অতুলনীয়। ২৩ জানুয়ারি তাঁর একক উদ্যোগে জাঁক জমকের সঙ্গে নেতাজী জয়ন্তী পালিত হতো। লালগোলা থেকে চলে গিয়ে আমার বছর ৭/৮ পরে একদিন কৃষ্ণনগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কালীবাবুর সঙ্গে দেখা। কামরায় আমার বাবা বসেছিলেন। বললনে — চলো, তোমার বাবাকে নমস্কার করে আসি। আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন পেনশন ছিল না - সহায় সম্বলহীন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় ও মদনবাবুর কথা মনে পড়ে। অভিজাত পরিবারে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র মেহনতী মানুষের

লড়াইয়ের সাথী হওয়ার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সাথে সহজেই মিশতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। মদনবাবুর অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলাম — সেখানে বীরেনদার সঙ্গে দেখা। মদনবাবু ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করায় আমার আর ৫ বৎসর চাকুরী ছিল, কেননা মদনবাবু আমার চেয়ে ১০ বৎসরের বড়ো ছিলেন। আমি বীরেনদাকে বলেছিলাম আমার ইচ্ছা এম.এন এ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন স্কুলের ব্যাপারে তিনি আর মাথা ঘামান না। আরও বলেছিলেন - "সুহাস আমার শ্বশুর বাড়ির দেশে গিয়ে জ্বালিয়েছে তার উপর আবার তুমি?" কান্দির বিশিষ্ট RSP নেতা, শিক্ষাবিদ সুবাস দাস কিছুকাল পুর্বে হেতমপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। হেতমপুরের রাজকন্যা বীরেনদার পত্নী। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মদনবাবুর সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখনও তাঁর কথায় হিন্দীর টান। অল্প বয়স্কদের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারতেন। সে সময় বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের অভাব ছিল। অঙ্কের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও অনুশীলনের দ্বারা নিজেকে ইংরাজী পড়ানোর যোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম প্রধান শিক্ষক — যিনি দীর্ঘ কর্ম জীবনের শেষে এই বিদ্যালয় থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। যতদূর জানি তাঁর পিতা বেণীবাবু এম.এন. এ্যাকাডেমিতে পড়েছেন। মদনবাবুর দাদা বালাবাবুর সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক ছিল। আমার বিদায় সম্বর্ধনার কথা মনে পড়ছে। চলে আসার কয়েকদিন পর অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। আমার বক্তৃতার শেষে আমি বলেছিলাম "হাজার মানুষের ভিড়ে একদিন আমি হয়ত হারিয়ে যাবো, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুবছরে যাদের আমি পড়িয়েছি তাদের স্মৃতিতে আমি বেঁচে থাকবো।" মদনবাবু তাঁর বক্তৃতায় এই কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন জীবনবাবুর যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে তিনি যদি সত্য সত্যই একদিন হারিয়ে যাই তাহলে সেটা তাঁর পরিবার বা যে অঞ্চলে তিনি বসবাস করেন শুধুমাত্র তাদের নয় আরও বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি হবে। আমার আকাঙ্খাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সঙ্কটের দিনে যেসকল ছাত্র আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে সাহাবাদের নীরেন দাস ও লালগোলার অখিল মালাকার আমাদের মধ্যে আছে। সৌরিন পান্ডে, বিপুল সরকার, অবনী সরকার ও নিহার রায় প্রয়াত হয়েছেন। তাদের সকলকেই স্মরণ করছি।

—x—

আমার আন্দামান ভ্রমণের দিনগুলি

সোহম দাস (দশম শ্রেণি)

মানুষের জীবনে কিছু স্বপ্ন থাকে, যা ছোটোবেলা থেকে মনের গোপন কোণে লালিত হয়। আমার তেমন একটি স্বপ্ন ছিল আকাশ পথে ভ্রমণ করার। গ্রামের আকাশে যখনই কোনো উড়োজাহাজকে মেঘের বুক চিরে উড়ে যেতে দেখতাম, তখনই মনে হতো – একদিন আমিও ওই বিমানে চেপে দূর দেশের পথে পাড়ি দেব। সেই স্বপ্ন যে এত সুন্দরভাবে বাস্তবের রূপ নেবে, তা কখনো ভাবিনি।

একদিন বাবার কাছে মনের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। অনেকদিন পর বাবা জানালেন যে আমরা আন্দামান ভ্রমণে যাচ্ছি। খবরটি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাস পড়ে আন্দামান সম্পর্কে আমার মনে এক রহস্যময় ও আকর্ষণীয় ছবি গড়ে উঠেছিল। এবার সেই কল্পনার জগৎকে বাস্তবে দেখার সুযোগ পেলাম।

নির্ধারিত দিনে আমরা পরিবারের সবাই লালগোলা থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানকার একটি হোটেলে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় পৌঁছে গেলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরের ব্যস্ততা, বিশাল উড়োজাহাজ এবং যাত্রীদের আনাগোনা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এল। বিমানে বসে যখন মাটি ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল, তখন মনে হচ্ছিল, আমি যেন স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করেছি।

প্রায় আড়াই ঘন্টার উড়ান শেষে আমরা পৌঁছালাম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে। বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি তার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রবাল প্রাচীর, সবুজ বনভূমি এবং বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে।

পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল ঐতিহাসিক সেলুলার জেল। ইতিহাসে পাতায় পড়া সেই 'কালাপানি' কারাগারকে সামনে থেকে দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বটুকেশ্বর দত্ত সহ অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের স্মৃতি যেন জেলের প্রতিটি ইট-পাথরে খোদাই হয়ে আছে। ব্রিটিশ শাসকদের অমানবিক অত্যাচারের ইতিহাস স্মরণ করে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিন সময়ের অভাবে বিখ্যাত 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো' দেখতে না পারলেও সেলুলার জেলার স্মৃতি আজও আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে।

পরদিন আমরা জাহাজে করে হ্যাভলক দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সমুদ্র যাত্রা ছিল একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর ও ভীতিকর। মাঝপথে উত্তাল ঢেউয়ের দোলায় জাহাজ যখন দুলছিল, তখন আমাদের মনে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই ভয় কাটিয়ে যখন হ্যাভলকে পৌঁছালাম, তখন আমাদের মনে যে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে চোখের সামনে উন্মোচিত হল প্রকৃতির এক অনুপম রূপ।

রাধানগর বিচ, কালাপাথর বিচসহ একের পর এক সমুদ্রসৈকতের সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করেছিল। নীল সমুদ্রের স্বচ্ছ জল, সাদা বালুকাবেলা এবং সারি সারি নারকেল গাছ মিলিয়ে যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশের

সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতির এত অপরূপ রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি।

এরপর আমরা নীল দ্বীপে যাই। সেখানে নিজের চোখে প্রবাল প্রাচীর বা কোরাল দেখার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই অন্য রকম। ভূগোল বইয়ে পড়া সেই কোরালের বাস্তব রূপ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের স্বচ্ছ জলের নীচে প্রকৃতির এই শিল্পকর্ম যেন এক অনন্য বিষয়।

দেখতে দেখতে আমাদের ভ্রমণের দিন শেষ হয়ে এল। বিদায়ের মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, যেন খুব কাছের কোনো প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আন্দামানের নীল সমুদ্র, সবুজ বনভূমি, শান্ত প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষের আন্তরিকতা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই ভ্রমণ শুধু আনন্দই দেয়নি, ইতিহাস, ভূগোল ও প্রকৃতিকে নতুনভাবে চিনতেও সাহায্য করেছে। তাই আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হিসেবে আন্দামান ভ্রমণের স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে।

—x—

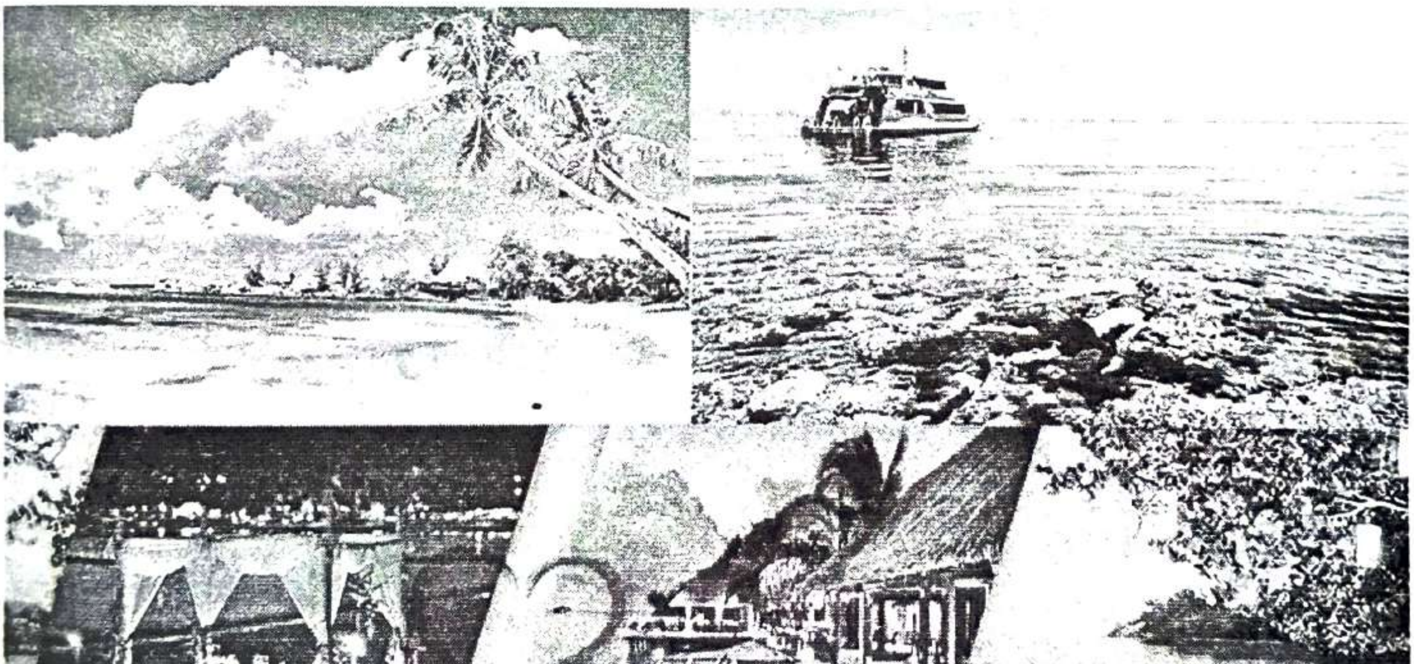

দার্জিলিং ভ্রমণ

এ.এন.আশফাক আলী (চতুর্থ শ্রেণির কর্মী)

গত পুজোর ছুটিতে আমি পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ছোটোবেলা থেকেই পাহাড় দেখার গভীর ইচ্ছা আমার মনে ছিল, তাই এই সফরটি আমার কাছে এক স্বপ্ন পূরণের আনন্দ নিয়ে এসেছিল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আমরা গাড়িতে করে দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি যত উপরে উঠছিল, ততই চারপাশের দৃশ্য বদলে যাচ্ছিল। সবুজ চা বাগান, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় আর শীতল হাওয়া আমার মনকে এক অদ্ভুত আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছিল। দার্জিলিং পৌঁছে প্রথম দিন আমরা ম্যাল রোডে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সেখানে ছিল মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য, ছোটো বড়ো অনেক দোকান এবং পর্যটকদের ভিড় দূরে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছিল মহিমান্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘা যা পুরো পরিবেশকে আরো মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিল। সন্ধ্যাবেলায় ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে গরম চা হাতে নিয়ে মেল রোডে হাঁটার অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিই অসাধারণ। পরেরদিন খুব ভোরে আমরা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাই। অন্ধকার কাটতে না কাটতেই আকাশ ধীরে ধীরে লালচে হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের প্রথম সোনালী আলো বরফে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে পড়তেই পুরো দৃশ্য যেন সোনার মতো ঝলমল করতে লাগলো। সেই মুহূর্তটি আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এরপর আমরা ঘুম, মঠ, বাতাসিয়া লুপ এবং দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত চা বাগান ও রক গার্ডেন ঘুরে দেখেছি। বাতাসিয়া লুপে দাঁড়িয়ে খেলনা ট্রেনের রেলপথ আর চারপাশের পাহাড়ি সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। চা বাগানে গিয়ে দেখলাম সারি সারি সবুজ গাছের মাঝে শ্রমিকরা চা পাতা তুলছেন দৃশ্যটি ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও জীবন্ত। দার্জিলিং-এর ঠান্ডা আবহাওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং মানুষের আন্তরিক ব্যবহার আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছে। এই ভ্রমণ শুধু আনন্দই দেয়নি আমাকে প্রকৃতির প্রতি আরো অনুরাগী করে তুলেছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আমি আবারও এই পাহাড়ের রানি দার্জিলিঙে ফিরে যেতে চাই এবং নতুন করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই।

—x—

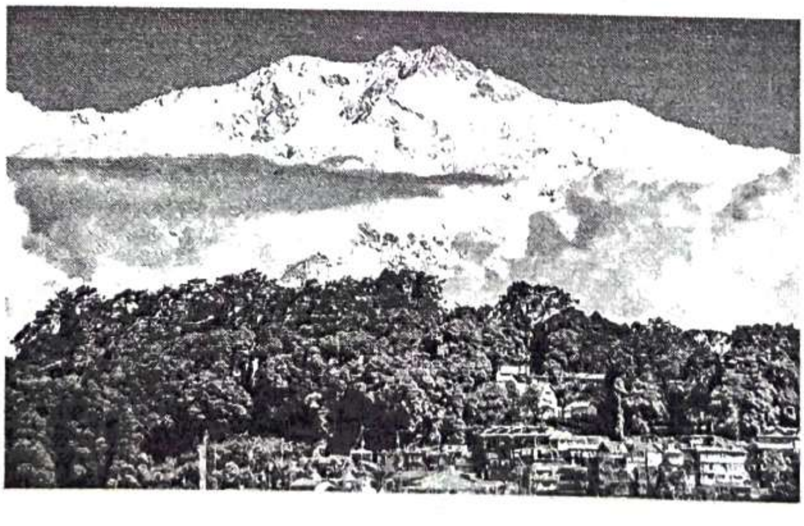

আমার প্রথম ট্রেকিং অভিজ্ঞতা

জাহাঙ্গীর হোসেন (সহকারী শিক্ষক)

Part - 1

ভূগোল নিয়ে পড়ার সুবাদে ছাত্র জীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ বেশ কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু বরাবরই ইচ্ছে ছিল একটু অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভ্রমণের, শ্রদ্ধেয় জাহাঙ্গীর মিঞা স্যারের দৌলতে 'Berhampore Adventure Club' এর হাত ধরে আমার প্রথম অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভ্রমণে রওনা। ট্রেকিং ছিল ২১ কিলোমিটার পথ 'মানেভঞ্জন থেকে ধোত্রে'। মানেভঞ্জন হল দার্জিলিং থেকে ২৬ কিমি দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ (Mean Sea Level) থেকে প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট ও ব্যস্ত ট্রানজিট শহর বা প্রবেশদ্বার। ভূগোলের ভাষায় ট্রানজিট শহর হল এমন একটি স্থান, যেখানে পরিবহন মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, এখানে পণ্য বা যাত্রীদের এক পরিবহন মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয় (যেমন — বন্দর থেকে মালপত্র নামিয়ে ট্রাকে তোলা, বা বাস থেকে নেমে ট্রেনে ওঠা)। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি একটি আদর্শ ট্রানজিট শহর বা 'ব্রেক অফ বাল্ক পয়েন্ট' বলা যেতে পারে। সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের সেই প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে মানেভঞ্জন।

সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণি মূলত ভারত ও নেপালের একটি প্রাকৃতিক সীমারেখা তৈরি করেছে। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি মূলত হিমালয়ের নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮৫০০ ফুট উঁচুতে সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের বাফার জোনে লুকিয়ে থাকা এক মনোমুগ্ধকর ও দূষণমুক্ত পাহাড়ি গ্রাম হল দার্জিলিং-এর 'ধোত্রে'।

ট্রেনের সমস্যা থাকায় আমাদের বহরমপুর থেকে শিলিগুড়ি বাসে যেতে হয়। 'Berhampore Adventure Club' এর দুটি টিম ছিল (1) 'Survival Team' (15-45yrs Age), (2) 'Nature Study Team' (5-14 yrs age). আমরা 'Survival Team' এ ছিলাম মোট ২০ জন। মানেভঞ্জনের কপি ধারার কাছে 'Survival Team' কে সমস্ত মালপত্রসহ নামিয়ে দেওয়া হয়, বাকিরা রওনা দেয় ধোত্রের উদ্দেশ্যে। সকলে Road side Dhaba তে ভাত, ডাল, ডিম আলুর ঝোল ও স্কোয়াশের চাটনি সহযোগে দুপুরের আহার সম্পন্ন করি। 'Survival Team' এর প্রত্যেক সদস্যের ট্রেকিং ব্যাগ (Rucksack) এ তিনদিনের সমস্ত খাবার ও সামগ্রী ভাগ করে ভরে দেওয়া হয়। তাতে প্রত্যেকের Rucksack এর ওজন আনুমানিক 20-25 kg হয়। (বলে রাখা ভালো যে অ্যাডভেঞ্চার মূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে নিজের ব্যাগ যতটা সম্ভব হালকা রাখা ভালো, প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া বাড়তি জিনিসপত্র নেওয়া উচিত নয়।)

তারপর আমাদের ২০ জনকে (ছেলে-১৫, মেয়ে-৫) বিখ্যাত ৩টি গিরিপথের নামে ভাগ করে। যথা (১) চুম্বুল লা (২) কাং লা (৩) রাথং লা। (তিব্বতি ভাষায়) 'লা' (La) শব্দের অর্থ হল পাশ (Pass) গিরিপথ।

তিনটি ভিন্ন রং এর ভেস্ট প্রত্যেককে পরানো হয়। 'Survival Team' এর ২০ জন ও দুই জন 'প্রশিক্ষক (Instructor)' সহ আমরা দুপুর ২:৪৫ মিনিটে পাহাড়ে ওঠা শুরু করি। পাহাড়ি পথটি ছিল বেশ খাড়া ও পাথুরে। প্রায় আধ ঘন্টা খাড়া চড়াই ভাঙার পর মনে হচ্ছিল আর উঠতে পারব না। মনে মনে ভাবছিলাম শুধু

কি আমার কষ্ট হচ্ছে? না বাকিদেরও একই অবস্থা! আসলে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুচাপ ও অক্সিজেনের পরিমাণ কিছুটা কমতে থাকে, ফলে হাঁটতে বেশি ক্লান্তি অনুভূত হয়।

আর কিছুক্ষণ ওঠার পরে এক দিদি বলেন — 'আমি বোধহয় আর উঠতে পারব না। নেমে যাওয়াই ভালো'। একথা শুনে সকলে তাকে মোটিভেট করতে থাকে। প্রশিক্ষক (Mintu Chakraborty) সকলকে বলেন যে দিদিকে লাইনের একদম প্রথমে দিতে। খুব ঠান্ডা তবু পরনে শুধু একটি টি-শার্ট ও ট্রাউজার তবুও যেন ঘেমে যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু হয়, সদ্য বৃষ্টি হওয়া ভেজা পাহাড়ে আমরা উঠে চলেছি। হঠাৎ একজন বলে ওঠে আমাকে 'জোঁকে' ধরেছে। জানি স্যাঁতসেতে ভিজেমাটি ও ঘন বনভূমি জোঁকের পছন্দের আবাসস্থল, তারপর সবাই লক্ষ্য করি সত্যি আমাদের পথে অসংখ্য জোক। ভয়ে ভয়ে পথ এগিয়ে চলি কিছুক্ষণ পর মোজার ভেতর একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। হ্যাঁ, ঠিক। যেটা ভয় করেছিলাম — আমাকেও জোঁক ধরেছে একটা লাঠি দিয়ে জোঁকটাকে ছাড়িয়ে ফেলি। এই জোঁকের ভয়ে বর্ষাকালে পাহাড়ের ট্রেকিং-এ অনেকে লবণের পোঁটলা লাঠিতে বেঁধে নিয়ে যায়। পাহাড়ে জোঁকের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথমবার। সকলে মনের মধ্যে ভয় নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে এগিয়ে চলেছি, চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর মেঘের আবরণে ঢাকা নিস্তব্ধ একটা পাইন বন সামনে দেখি সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়। স্বচক্ষে দেখা ছাড়া তার বর্ণনা দেওয়া ভীষণ কঠিন। এখানকার শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর পাইন, ওক ও রডোডেনড্রনের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এমন গগনচুম্বী সারিবদ্ধ পাইনের সৌন্দর্য উপভোগ জীবনে প্রথম। ততক্ষণে আমাদের হাঁসফাঁস, জোঁকের ভয়, কষ্ট সবটা যেন প্রকৃতির অপরূপ মহিমা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। সকলে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আস্বাদন নিতে মেতে উঠেছি ও কিছু ছবি তুলে তারপর আবার রওনা।

ক্রমশ উঠে চলেছি। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, আমরা কি একটু সমতল পৃষ্ঠে হাঁটবো না? শুধুই যে খাড়া ঢাল!

সকলে প্রকৃতির নিস্তব্ধ অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী জঙ্গলে বুনো স্ট্রবেরি লাল টকটকে হয়ে চাদরের মতো বিছিয়ে রয়েছে। উঁচু শীতল ও আর্দ্র জলবায়ু বুনো স্ট্রবেরি জন্মানোর জন্য আদর্শ পরিবেশ। দেখে ভীষণ লোভ হচ্ছে, কেউ কেউ তুলে খেতে শুরু করেছে। আমিও নিজেকে না সামলে তুলে মুখ দিয়ে অনুভব করি এতো আমাদের দিকের স্ট্রবেরির থেকে আকারে ছোটো কিন্তু টেস্টে অনেক গুণ ভালো। প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে 'চিত্রে (Chitrey)' পৌছালাম। মানেভঞ্জন থেকে মাত্র ৩ কিমি চড়াইয়ের প্রায় ৮৩৫০ ফুট উপরে অবস্থিত সবুজ গালিচায় মোড়া একটি শান্ত গ্রাম। সদ্য বৃষ্টি হয়েছে আকাশের মেঘগুলো পাশ কাটিয়ে ভেসে চলেছে, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। এ দৃশ্য যেন ভুলবার নয়। প্রকৃতির অপরূপ মহিমায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি গন্তব্যের দিকে। সময় তখন প্রায় বিকেল ৪:৪০ মিনিট আমরা নেপালের 'লামে ধুরা (Lamey Dhura)' পৌছাই। লোককথা অনুযায়ী, এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর (লামা) নাম থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছে। এখানে হাতেগোনা কয়েকটি তিব্বতি ও শেরপা পরিবারের বাস। আমাদের প্রথম দিনের গন্তব্য ছিল 'মেঘমা (Meghma)'। মানেভঞ্জন থেকে ৯ কিমি দূরে, সান্দাকফু ট্রেকের একটি জনপ্রিয় বিরতির স্থান হল 'মেঘমা'। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫:৪০ মিনিট এখনো ৪ কিলোমিটার পথ বাকি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা 'হ্যামলেট' চোখে পড়ে। ভূগোলের ভাষায় হ্যামলেট হল

'প্রায় যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামীণ জনবসতি।

আমরা কয়েকজন সেখানে চা পান করি। খুব ঠান্ডা চারিদিকে। অন্ধকারে আমরা হেঁটে চলেছি 'মেঘমা (Meghma)' এর উদ্দেশ্যে। এখনো অনেকটা পথ হাঁটা বাকি। চারিদিক মেঘ ও কুয়াশা ঢাকা অন্ধকার অবিশ্বাস্য রহস্যময় শান্ত পরিবেশ 'মেঘমা' নামের যথেষ্ট সার্থকতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'মেঘমা' শব্দের অর্থই হল 'মেঘের দেশ'। অধিক উচ্চতা ও আর্দ্র বায়ুর কারণে বছরের অধিকাংশ সময় জায়গাটা মেঘে ঢাকা থাকে। কখনো মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। আর্দ্র বায়ু পাহাড়ে বাধা পেয়ে উপরে উঠে শীতল হওয়ায় ঘনীভবনের মাধ্যমে এই মেঘের সৃষ্টি হয় যা ভূগোলে বহুবার পড়েছি। এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম।

চারদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। একসময় সকলের প্রয়োজন হয়। সবাই খুব ক্লান্ত তবুও গন্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি রাত্রিবেলা জঙ্গল যে কতটা নিস্তব্ধ সেটা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। অবশেষে মোট ১৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে রাত্রি ৮:৪০ মিনিটে 'মেঘমা (Meghma)' পৌঁছলাম Meghma পৌঁছে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। সবাই ভীষণ ক্লান্ত। পা ওঠে না, অনেক কাজ বাকি। তাঁবু খাটাতে হবে, রান্না করে খেতে হবে। শরীর যে আর পারে না, তবে মনে সবার খুব জোর। সকলে দলবদ্ধভাবে তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে নিলাম। এবার রান্নার পালা, কেরোসিনের স্টোভ জ্বালানো শুরু হল, কোনমতেই স্টোভ জ্বলে না, কারণ কেরোসিনে প্রচুর ময়লা। আব্দুল মইদ (জনি) ভাইয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় শেষে স্টোভ জ্বালানো গেল। প্রথমে হালকা করে সরু চালের মুড়ি ও একটি ছানাবড়া। শেষে কফি খাওয়া। সিদ্ধান্ত হল যেটা কম সময়ে রান্না করা যাবে সেটা করা হোক। ব্যাস ২ মিনিটে ম্যাগি আবার কি! কয়েকজন ম্যাগি খেল বাকিরা তখনও না খেয়ে।

এবার আমরা কয়েকজন ভাবলাম খিচুড়ি রান্না করা হোক। সকলে মিলে খিচুড়ি রান্নায় মেতে উঠলাম। কেউ জল নিয়ে এলো, কেউ আলু কাটলো, কেউ পেঁয়াজ, কেউ লঙ্কা। শুরু হল ডিম খিচুড়ি রান্না। রান্না শেষে সকলকে ডাকা হল। ততক্ষণে অনেকেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। খিচুড়ি রান্না চলছে সেই রাতে আমার টয়লেটের প্রয়োজন হল। মেঘে ঢাকা দূষণ হীন পাহাড়ী আবহাওয়ায় চকচকে নক্ষত্র খচিত খোলা আকাশের নীচে টয়লেট। টর্চ হাতে নিয়ে পাহাড়ের একটু নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি টয়লেটের উদ্দেশ্যে (বলে রাখা ভালো তাঁবুর খুব কাছে টয়লেট না করাই ভালো কারণ টয়লেটের সঙ্গে বেরোনো সোডিয়াম ক্লোরাইড অনেক বন্যপ্রাণী চেটে খেতে খুব পছন্দ করে। ফলে কাছাকাছি টয়লেট করলে আমাদের সকলের বিপদ বাড়তে পারে) পাহাড়ের নীচের দিকে টর্চ জ্বালতেই চমকে গেলাম। একদল বন্য ঘোড়া টর্চের আলো পড়তেই দৌড়ে পালাচ্ছে। ১০ থেকে ১৫ টা হবে। ভয়ে চমকে উঠেছি, পরক্ষণে ভাবলাম জঙ্গলে এটা সাধারণ ব্যাপার। ঘোড়াগুলো ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেল। আমি টয়লেট সেরে তাঁবুতে ফিরলাম।

তাঁবুতে এসে সাহিদকে বললাম বিষয়টা। সে মজা করে বলে উঠলো তুমি ভূত দেখেছ, রাত্রে আবার ঘোড়া। আমার মনে একটু ভয় জাগলো।

আমরা খিচুড়ি খেয়ে সব গুছিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে শুঁয়ে পড়লাম। আমরা মোট ৬টি তাঁবু করেছিলাম।

রাত্রি তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে হবে। তাঁবুর পাশে কি যেন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বিদ্যুৎতের ঝলকানিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। বলা হয়নি, আমাদের সঙ্গে প্রায় ৫ কিলোমিটার হেঁটে একটি কুকুর খাবারের আশায় এসেছিল এবং আমাদের সঙ্গেই রাত্রে ছিল। তাঁবুর বাইরে যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তা সকলে ভেবেছিল কুকুরটার আওয়াজ হবে হয়তো। কিন্তু না ...

Part - 2

রাতে তাঁবুর বাইরে অদ্ভুত আওয়াজ সকলের মনে যে প্রশ্নচিহ্ন জাগিয়েছিল তার উত্তর পাওয়া গেল খুব সকালে। আসলে সেই বন্য ঘোড়ার দলটা আমাদের তাঁবুর খুব কাছাকাছি এসেছিল, নরম মাটিতে বন্য ঘোড়ার অসংখ্য পায়ের ছাপ তার স্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়া সেই বন্য ঘোড়ার দলকে সকালে অনেকেই দেখতে পায়। এ যেন এক ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা, বন্য ঘোড়াগুলি আমাদের তাঁবুগুলিকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে পারত। প্রমাণিত হল তাহলে আমি রাত্রে নিশ্চয়ই কোনো ভূত দেখিনি।

সকালে পরিষ্কার আকাশ। সূর্যের আলোকরশ্মি উপত্যকায় পড়ে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে। আমি ও সামিম টুথব্রাশটা হাতে নিয়ে পাহাড়ের কোলে সেই সৌন্দর্য অনেকক্ষণ উপভোগ করে চলেছি।

দুটি স্টোভ জ্বালিয়ে একটিতে ডিম সেদ্ধ অপরটিতে কফি তৈরি শুরু হয়েছে। সকলে চাল ভাজা, দুটি করে খেজুর, সেদ্ধ ডিম ও কফি খেয়ে ভাত রান্নার কাজ শুরু হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের রওনা 'টুমলিং'-এর উদ্দেশ্যে। চিকেন আলুর ঝোল ভাত খেয়ে আবার ব্যাগ গোছানো। তারপর টিম ইনস্ট্রাক্টর (মিন্টু ও নিলয় স্যার) তিনটি গ্রুপ কে ডেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রথম দিনের ট্রেকিং অভিজ্ঞতা কেমন লাগছে, কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। সবশেষে আমরা টেন্ট গুছিয়ে ট্রেন্ট এলাকা পুরোপুরি পরিষ্কার করে সেখান থেকে রওনা দিলাম Tumling এর দিকে। বলে রাখা ভালো পাহাড়ে ভ্রমণে সকলের পরিবেশ রক্ষার তাগিদে কড়া ভাবে ডিসিপ্লিন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা উচিত।

আবার পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। আজ আকাশ অনেকটা পরিষ্কার দূর পর্যন্ত উপত্যকাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলো পাহাড়ি ঘাসের শিশির কণাগুলো উপর পড়ে মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে। ছোটো বড়ো ঝর্ণা পেরিয়ে চলেছি গন্তব্যের দিকে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের চারিপাশে বিভিন্ন রকম বাহারি ফুল। মনে হচ্ছিল প্রতিটা বাড়ি যেন এক একটা ছোটোখাটো নার্সারি। গ্রামে অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে মৃদু একটা আওয়াজ ভেসে আসছে আমরা এগিয়ে চলেছি। আওয়াজটা যেখান থেকে ভেসে আসছিল তার কাছাকাছি যেতেই মনে হল ঈশ্বরের প্রার্থনা চলছে, চারিদিক অত্যন্ত শান্ত। শুধুমাত্র প্রার্থনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমরাও শান্তভাবে এগিয়ে চললাম। ঘন্টা দুয়েক পর প্রায় ৯৭০০ ফুট উচ্চতার মেঘে মোড়া অসম্ভব সুন্দর একটা গ্রাম 'টুমলিং' পৌছালাম। আমাদের ট্রেকিং টিমকে দেখে সেখানে ঘুরতে আসা কয়েকজন আমাদের ছবি তুলতে থাকলো। সকলে কিছুটা দূরে গিয়ে একটি উঁচু জায়গায় রাস্তার ধারে বসলাম। ৯৭৪৫ ফুট উঁচুতে নেপালে Tumling হ্যামলেট অবস্থিত।

সেই উঁচু জায়গায় বসে চানাচুর, কেক, চকলেট, খেজুর একে একে করে খাওয়া শুরু হল। ততক্ষণে চারিদিক মেঘে ঢেকেছে। মেঘের মধ্যে সকলে বসে রয়েছি। আজ আশেপাশেই তাঁবু তৈরি করে থাকতে হবে। কিন্তু SSB (Sashastra Seema Bal) এর নির্দেশ আছে যেখানে সেখানে তাঁবু তৈরি করা যাবে না। তাই আমাদেরকে পাশের একটি হোমস্টেতে কথা বলে তাঁবুর জন্য জায়গা ভাড়া নিতে হয়। এবার তাঁবু তৈরির পালা, তাঁবু তৈরি শুরু হয়েছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের তাঁবুর সবে ইনার টা টাঙানো হয়েছে, আউটার এখনো টাঙ্গানো বাকি। বৃষ্টিতে ইনারটা পুরোপুরি ভিজে গেল, কোনোরকমে আউটার

দিয়ে ঢেকে রাখলাম। জোর বৃষ্টির জন্য সবাই পাশের হোমস্টের বারান্দায় সমস্ত লাগেজ নিজেরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে দেখে হোমস্টে থেকে অর্ডার করা চা খেলাম। সবে বৃষ্টি থেমেছে তাঁবুর কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম তাঁবুর ভেতরে অনেকটা জল জমেছে। কাপড় দিয়ে জল পরিষ্কার করা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সূর্যের আলো এসে পড়ল তাঁবুর উপর। সাহিদুজ্জামান (সাহিদ), আব্দুল মঈদ (জনি) ও শতদল দা অনেক খেটে তাঁবুর চারপাশে নালা তৈরি করল যেন বৃষ্টির জল দাঁড়াতে না পারে। তাঁবু টাঙানোর পর সকলে মুড়ি খেলাম ও সাথে একটি করে ছানাবড়া। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে পাহাড়ে ছানাবড়া পাচ্ছি কোথায়? আমাদের মিন্টু স্যার থাকলে এই সমস্ত খাবারের পরিকল্পনা মাফিক বন্দোবস্ত থাকে।

আমাদের স্পেশাল ছানাবড়ার ৮ টা মতো সেই হোমস্টের মালিকদের দিলাম। আজ ট্রেকিং রুট কম ছিল কেউ ক্লান্ত নয়, ফুরফুরে মেজাজ, মনোরম পরিবেশ, মাত্র এক কিলোমিটার দূরে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক। সকলে মিলে হাঁটতে বেরলাম সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের দিকে। জীববৈচিত্রের জন্য সমৃদ্ধ সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান বিপন্ন (Endangered) রেড পান্ডার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। যদিও আমাদের তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের দিকে যেতে মনে হচ্ছে রাস্তার দুই ধারে অর্কিডের মেলা বসেছে, আর বুনো স্ট্রবেরির সমাহার, মাঝে মাঝে ব্লু পাইন গাছ ও অসংখ্য রডোডেনড্রনের গাছ। জীবনে প্রথম সেদিন ব্লু পাইন গাছ দেখলাম। ব্লু পাইন গাছ অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। ব্লু পাইন হল পূর্ব হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ।

কিছুটা দুর যেতে একটু বাঁকা রাস্তায় হঠাৎ মোবাইল চেক করতে দেখলাম এখানে নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফোন দিয়ে কোনোরকম হ্যালো হ্যালো করতে করতে জানাই আমরা ঠিক আছি ভালো আছি। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের গেটের বাইরে বেতের তৈরি একটি সিট রয়েছে যার পেছনে রয়েছে অসংখ্য ছোটো ছোটো ফুল যা দেখলে প্রাণ ভরে যায়। এছাড়া নাম না জানা বিভিন্ন সুমধুর পাখির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল, সাথে পার্কের ভেতর থেকে দূরের ওই উপত্যকা ও চকচকে আকাশ যেন অকল্পনীয় বাতাবরণ তৈরি করেছে। একের পর এক মেঘ ভেসে চলেছে উপত্যকা দিয়ে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়ছে উপত্যকায়। মেঘগুলি তখন ঘষা কাঁচের মতো দেখাচ্ছে। সেই পথেই একটি অদ্ভুত ফুল দেখতে পাই যেটি কোবরা লিলি (একটি বিরল পাহাড়ি উদ্ভিদ, যা আর্দ্র ও শীতল পরিবেশে জন্মায়) এরকম অসংখ্য নাম না জানা ফুলে ভরা চোখ জুড়ানো দৃশ্যের সাক্ষী আমি নিজে। পার্কের ভেতর একটা জায়গায় সবাই বসে মিন্টু স্যারের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুরু করলাম আমরা। আড্ডা জমে উঠেছে নানান ধরনের ট্রেকিং-এর গল্প, সেই গল্পগুলি ছিল যতটা ভয়ঙ্কর ততটাই সুন্দর। আমাদের মধ্যে থেকেও অনেকেই তার নিজের জীবনের উপলব্ধি শেয়ার করে নিচ্ছি। আড্ডা দিতে দিতে ঘড়ির কাঁটা বলে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। সকলে ফিরে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে কফি করে খেলাম। রাত্রে আবার ভাত চিকেন আলুর ঝোল করে খাওয়া হল। তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম, কেউ কেউ তাঁবুর ভেতর থেকে গান গাওয়া শুরু করলো। এভাবে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। এইভাবে আরো একটি রাত কেটে গেল তাঁবুতে। আর হ্যাঁ শুনেছি টুমলিং থেকে নাকি সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘাসহ পূর্ব হিমালয়ের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। মনে মনে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খুব কাছ থেকে দেখার আকাঙ্খা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

Part - 3

টুমলিং-এর সকাল ঘড়িতে ৫টা বেজে ১৫মিনিট। পাহাড়ের কোণায় সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আমি শামীম দা তাঁবু থেকে বেরিয়ে টুমলিং টপে হাজির কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে বলে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ২০০ মিটার উপরে উঠলেই টুমলিং টপ। টুমলিং টপে উঠতেই — 'এ কি কাঞ্চনজঙ্ঘা তো আগেই দেখেছি এই দৃশ্য যে জীবনে প্রথমবার'। মনে হচ্ছে পাহাড়গুলো সবে ঘুম থেকে উঠছে, সবুজ পাহাড়ে মেঘ চাদরের মতো বিছিয়ে রয়েছে, তার উপর সূর্যের কিরণ পড়ে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির স্বাদ আমাদের দিচ্ছে। পরিষ্কার আকাশ, সূর্যের আলো যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিক কেমন প্রকৃতিময় করে তুলেছে।

টুমলিং টপে কয়েকজনের সঙ্গে কথা হল তারাও আমাদের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে এসেছে, ওদের সাথে কথায় কথায় ওদের থেকে জানলাম একদল ট্রেকার্স নাকি সান্দাকফুর দিক যেতে একটা চিতাবাঘ দেখতে পেয়েছে ক্যামেরাবন্দিও নাকি করেছে। মনে মনে একটু ভয় হল। চোখের সামনে দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। হালকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ক্রমাগত ভেসে আসা মেঘের কারণে যেমনটা টুমলিং থেকে কাঞ্চজঙ্ঘা দেখা উচিত ছিল তেমনটা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা গেল না। পাহাড়ে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

এদিকে আজকে Tumling থেকে Tonglu পর্যন্ত যেতে হবে। যেটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে। তারপর Tonglu থেকে Dhotrey.

আজ স্পেশাল খিচুড়ি, ডিম, চাটনি ও সয়াবিনের তরকারি খেয়ে রওনা দেওয়ার পালা। ঘড়িতে তখন দশটা বাজে। আমরা সকলে রওনা দিলাম টংলু (Tonglu) এর উদ্দেশ্যে। টংলু সিঙ্গালিলা রিজের অন্যতম উচ্চ স্থান, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘসহ পূর্ব হিমালয়ের বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণিও দেখা যায়।

অনেক উঁচু পথ। সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবুও হার মানছি না, পৌঁছতে হবেই। অবশেষে পৌঁছালাম। টংলু টপে রয়েছে সাইবেরিয়ান আইরিশ ভ্যালি, অক্টোবর থেকে জুন হল টংলু ঘোরার সেরা সময়। আইরিশ ভ্যালি পৌঁছে দূর থেকে Tonglu Lake দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অনেক আইরিশ ফুটে রয়েছে, তা দেখে আনন্দ ও ক্লান্তিতে আমরা অনেকেই শুয়ে পড়েছি আইরিশ ভ্যালিতে। তারপর বহরমপুর অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের ব্যানার নিয়ে গ্রুপ ফটো তোলা হল, সকলে জাতীয় সঙ্গীত গাইলাম।

সমবেত কণ্ঠে ধনধান্যে পুষ্প ভরা গাওয়া হল। অবর্ণনীয় মুহূর্ত সবটাই উপলব্ধির বিষয় সবাই যেন প্রকৃতির মাঝে মন প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছি। তারপর হালকা খাওয়া-দাওয়ায় দুটি করে খেজুর, মুড়ি, কেক, চানাচুর, বুদিয়া খাওয়া হল সাথে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া হল। Tongle Lake-এর কাচের মতো স্বচ্ছ জলে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আপনাকে অনেকক্ষণ বেঁধে রাখবে।

Tonglu Lake এর পাশ দিয়ে Dhotrey এর দিকে নামতে শুরু করলাম। বৃষ্টি শুরু হল সবাই পঞ্চু মাথায় দিয়ে আস্তে আস্তে হেটে চলেছি। জোর-বৃষ্টিতে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছি তারপর আবার হাঁটা। এইভাবে অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছালাম এখানে একটা ছোট্ট মতো বসার জায়গা করা আছে। সেখানে আবার আড্ডা নানান রকম অভিজ্ঞতার গল্প সকলে মন দিয়ে শুনছি নিলয় ও মিন্টু স্যারের কাছে। নিলয় স্যারের কণ্ঠে এই মনোরম পরিবেশে একটা গান শোনা হল — 'ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো ... বৃষ্টি হয়েই চলেছে ঘন জঙ্গল এর মাঝ দিয়ে পঞ্চু মাথায় দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছি

Dhotrey এর দিকে। প্রথমদিন মানেভঞ্জন থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া আমাদের Dhotrey এর টিম Survival Team-এর অপেক্ষায় আছে।

আমরা পৌঁছালাম আমাদেরকে অভিবাদন জানানো হল। কিছুক্ষণ পর কোলড্রিংস ও চা দেওয়া হল। এখানে বহরমপুর অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের নিজস্ব রাঁধুনি থাকায় খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই। চিকেন ও পাঁচ তরকারি দিয়ে ভাত খেলাম।

রাত্রে ক্যাম্প ফায়ার হবে, কিন্তু আবহাওয়া মোটেও ভালো নয়। বৃষ্টি পড়ছে। খোলা আকাশ এর পরিবর্তে একটা জায়গায় ক্যাম্প ফায়ার এর ব্যবস্থা করা হল। কেউ গান করল, কেউ নাচ, কেউ আবৃত্তি, জমজমাট ক্যাম্পফায়ার হল। রাত্রিবেলা চিকেন বিরিয়ানি, ছানাবড়া খেতে দেওয়া হল। এখন আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়েছে, তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে।

মিন্টু স্যারকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলের দিকে। হ্যাঁ এখন আমাদের নাইট ট্রেকিং হবে। ১০-১৫ মিনিট হেঁটে জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা ছোট্ট একটি চালা তোলা আছে এমন জায়গায় পৌঁছলাম। ঘড়িতে রাত ১২ টা। জঙ্গলের মাঝে সকলে বসে আড্ডা বিভিন্ন গল্প করেই চলেছি। জঙ্গল যে কতটা নিস্তব্ধ মাঝে মাঝে তার উপলব্ধি করছি। এত রাতে জঙ্গলের মাঝে বসে থাকার যে কি মজা সেটা বলে বোঝানোর নয়। মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় চারিদিক দেখে নিচ্ছি কোথাও কোনো চোখ জ্বলজ্বল করছে কিনা। আশেপাশে মালিঙ্গো বাঁশের জঙ্গল, কিছুটা দূরে সারি সারি পাইন গাছ। জঙ্গলের কচি বাঁশ ভাল্লুকের পছন্দের।

আকাশের তারা জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ পরস্পর তিনটে তারাখসা দেখলাম। মনে হল খুব কাছে, এত কাছ থেকে তারাখসা আমি আগে কখনো দেখিনি। আর তারাখসার আলো জঙ্গলটাকে হঠাৎ আলোকিত করে তুলল। সম্রাট অসাধারণ ছবি তোলে, এই সুযোগ হাতছাড়া করলো না। সম্রাট রাতের আকাশের একটা অসাধারণ ছবি তুলল যা দেখলে মন ভরে যায়।

অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর আমরা ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। এখন সকাল হওয়ার অপেক্ষা, বাড়ি ফেরার পালা।

– x –

চার দেওয়ালের বাইরে

'ম্যায় হুঁ না'

সাফিকুর রহমান (সহকারী শিক্ষক)

স্টাফরুমে বসে আছি। নিতাইদা এসে বললেন, আপনাকে নতুন হেডমাস্টারমশাই ডাকছেন। ছাত্র হই আর সহশিক্ষক, হেডমাস্টারের ডাক মানেই আলাদা ধুকপুকানি।

বলুন মাস্টারমশাই। সসঙ্কোচে বললাম।

আমার পড়াশোনা বিশ্বভারতীতে। আর তুমি তো জানো শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা।

তখন আমি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা ছেড়ে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসবে সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

শুনেছি বাংলার শিক্ষক হয়েও তুমি প্রতি বছর বিভিন্ন বিভাগের সাথে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাও!

না, মানে, আসলে ...

বিষয় শিক্ষকরা যাবেন ঠিক আছে। তাই বলে ...

মরিয়া হয়ে বললাম, বেড়াতে আমার ভালো লাগে।

সে তো আমাদেরও লাগে। তাহলে -

খুব বলতে ইচ্ছে করল, তাহলে আপনারাও চলুন। চুপ করে আছি দেখে আবার বললেন, কিছু বলো!

আসলে ওরা ডাকে। ভালোবেসে নিয়ে যায়।

সে তো আমিও ভালোবেসেই ডেকেছি। একবার আমাদেরকেও নিয়ে চলো।

ওহ! এই কথা। এ তো চেনা মাঠ। সোজা হয়ে বসলাম। মনে মনে বললাম ঝেড়ে কাশুন তো মশাই।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেমন যাচ্ছ যাও। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়ো।

আপনি যাবেন? তাহলে তৈরি হোন, জোট বাঁধুন।

লয়ে রশারশি, করি কশাকশি, পোঁটলা বাধার আগে তালিকা তৈরি শুরু হল।

আর এসব ক্ষেত্রে তালিকা তৈরি অনেকটা ডাক্তারের প্রেসার মাপা যন্ত্রের মতো। পারদ একবার সোঁ করে উঠে যায়, তারপর অনেকটা নেমে আসে। শেষে ওঠানামা করতে করতে একজাগায় স্থির হয়।

ঐ সূত্র মেনেই একসময় পারদ স্থির হল। টিকিট হল। বুকিং হল। বড়োদিনের আগেই বেরিয়ে পড়লাম। রঞ্জিতদা (রঞ্জিত কুমার চৌধুরী), লাল্টুদা (গজেন্দ্রনাথ দাস) আজিমুদ্দিনদা এবং হেডমাস্টার সপরিবারে। বাকিরা একা একা আহা-রে! ঝুমা, মানালি, রাকেশ, সমীর, অরিন্দম, পার্থ সবাই খুব এক্সাইটেড।

ট্রেনে যাওয়া, গাড়িতে ঘোরা, হোটেলে থাকা, প্রকৃতিকে দেখা, মেঘের মধ্যে হাঁটা, চা গাছের উপর শোয়া, সূর্যোদয়ের স্বাদ নেওয়া, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় স্নান, পাক খেয়ে বমি করতে করতে দুটো দিন কেটে গেল।

ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছি। সকালের আলো ফুটতে দেরি আছে। বাকিরা তখনো দুটো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের দেশে। পাহাড়ি পথে ইতিউতি ঘুরছি। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রাকেশ এবং রঞ্জিতদার সাথে। বললাম

চলুন একটু হাঁটা যাক। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম কিছুটা ট্রেক করতে পারলে একটা দারুণ স্কুল পাবে। খুব সুন্দর।

একটা দোকান থেকে কয়েকটি চকলেট কিনে নিয়ে পাহাড়ি নিয়ম মেনে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বড়ো রাস্তা ছেড়ে ক্রমশ সরু পাহাড়ি পায়ে চলা পথ শুরু হল। রাস্তার খাড়াই ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। অনেকটা ট্রেক করা রাস্তার মতো পাহাড়ি পথ। একদিকে খাদ, তাতে গাছের সারি। কোথাও পাথরের সিঁড়ি, কোথাও কাদামাটি, কোথাও শুকনো পাতা বিছানো পথ। মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠছি। তবে নিজের জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিল রঞ্জিতদাকে নিয়ে কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনিই আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ করেই পথ শেষ। আর তার পরেই ... মনে হল, যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েছি। পাহাড়ের বুকের ওপর বিস্তীর্ণ সমতল জমি। যেন কেউ যত্ন করে সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। সামনে বিশাল মাঠ। আরও একটু দূরে সুদৃশ্য একটি চার্চ। তার পাশে একের পর এক ভবন। স্টেডিয়াম-সমান খেলার মাঠ। সারা রাতের শিশিরে ঘাসের ডগায় বরফের পাতলা আস্তরণ। তার ওপর দিয়ে হাঁটতেই মুচমুচ করে শব্দ উঠেছে। প্রথমে অবাক হলাম। তারপর ইচ্ছে করেই আরও কয়েক পা হাঁটলাম। সেই শব্দ যেন শীতের সকালের নিজস্ব সঙ্গীত।

মাথার ওপর নীল আকাশ। সামনেই বড়সড় একটি চাঁদ। এত বড় চাঁদ আগে দেখেছি কি না মনে নেই। মনে হচ্ছিল, হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলতে পারব। কিছুক্ষণ আমরা তিনজনই নিশ্চুপ। কিছু দৃশ্যের সামনে ভাষা বড় অসহায় হয়ে পড়ে।

হঠাৎ চোখে পড়ল নামফলক। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ... সেন্ট পলস স্কুলে। মুহূর্তের মধ্যে যেন শৈশব, যৌবন আর সিনেমার পর্দা একসঙ্গে এসে মিশল।

এই সেই স্কুল! সেখানে শাহরুখ খান অভিনীত 'ম্যায় হুঁ না' ছবির শুটিং হয়েছিল। কতবার যে ছবিটা দেখেছি, তার হিসেব নেই। সেই লন ... সেই করিডর ... সেই ক্লাসরুম ...

মনে হচ্ছিল, যেন চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাব দড়ি হাতে মেজর রাম প্রসাদ শর্মা রূপী শাহরুখ খান এর বিখ্যাত দৌড়। কোথাও সুস্মিতা সেনের হাসি ভেসে উঠবে, কিরণ খেরের ডাক শোনা যাবে, সতীশ শাহের মুখভঙ্গিতে আবার হেসে উঠবে পুরো স্কুল।

বড়দিনের ছুটি চলছে। তাই ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রী নেই। অনুমতি নিয়ে স্কুলের ভেতর ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন শুধু পড়াশোনার জায়গা থাকে না, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সিনেমা আর স্মৃতির অংশ হয়ে ওঠে, তখন তাকে নতুন করে চিনতে হয়। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, কত প্রজন্ম এখানে বড় হয়েছে। কত শিক্ষক হয়তো ব্ল্যাকবোর্ডে প্রথম অক্ষর লিখেছেন কত ছাত্র জীবনের প্রথম স্বপ্ন দেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবনা — 'বিদ্যালয় কেবল পাঠ দেওয়ার স্থান নয়, মানুষের জীবন গড়ে ওঠার ক্ষেত্র।"

একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে সারাটা দিন কাটল। বিভিন্ন স্পট ঘুরে বিকেলে হোটেল ফিরছি। স্টেশনের পাশ দিয়ে আসছি। টয়ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ লোভ হল। এ সেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (DHR)। ১৮৮১ সাল

থেকে চলছে। ১৯৯৯ সালে Mountain Railway of India শিরোনামে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে।

ট্রেনটাকে দেখেই মনে হল, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। আমাদের গাড়িতে ছিল পার্থ সরকার — সংস্কৃতের শিক্ষক, প্রাণবন্ত, চিরউৎসাহী। তাকে বললাম, — "পার্থ, নেমে এস।" সমীর সামন্তও সঙ্গ দিল।

গাড়ির বাকিদের বললাম, — "আপনারা হোটেলে যান। আমরা একটু পরে আসছি।"

সোজা চলে গেলাম টিকিট কাউন্টারে। ট্রেনের সময়সূচি জেনে নিলাম। আমাদের পরদিনই ফেরার কথা। হাতে বাড়তি সময় নেই। তবু মাথার ভেতর তখন একটাই পরিকল্পনা ঘুরছে। এই ট্রেনে চাপবই। তারপর কেউ গাইবে, আরাধনার 'মেরে সপনো কি রানি' আবার কেউ গাইবে 'কস্টা মাজা হ্যায় লে লহিমা' (পরিণীতা, ২০০৫)।

হোটেল থেকে চেক-আউট করে সবাই গাড়িতে উঠব। লাগেজ যাবে তিনটি টাটা সুমোয়। আমরা মাঝপথে নেমে ওই ছোট্ট ট্রেনে চেপে বসব। গাড়িগুলো রাস্তা ধরে এগোবে, আর আমরা পাহাড়ের বুক চিরে রেলপথ ধরে যাব। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আবার গাড়ির সঙ্গে মিলিত হব।

পরিকল্পনাটা শুনে সবার চোখ চকচক করে উঠল। বললাম টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

সন্ধেটা কেটে গেল ম্যালে ঘুরে। বড়দিনের রাত। আলোয়, কোলাহলে, উৎসবে পাহাড় যেন আরও আপন হয়ে উঠেছিল। রাতে হোটেলে কেক কাটা হল। কে কত বড় টুকরো পেল, তা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা চলল অনেকক্ষণ।

পরিদিন সকাল।

সবকিছু পরিকল্পনা মতোই এগোচ্ছে লাগেজ গাড়িতে তুলে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই স্টেশনে। সবার মুখে তখন শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস। মনে হচ্ছিল, শিক্ষক নই, আবার যেন ছাত্র হয়ে গেছি। একজন একজন করে ট্রেনে উঠে পড়ছি।

ঠিক সেই সময় টিকিট পরীক্ষক বললেন, — "আপনাদের ছয়জনের টিকিট নেই।"

আমি অবাক। — "সে কী! টিকিট তো কেটেছি"!

তিনি টিকিট দেখে শান্ত গলায় বললেন, — "এই ছয়টি টিকিট আগামীকালের।"

মুহূর্তের মধ্যে যেন সব আনন্দে ব্রেক লেগে গেল। ছুটলাম কাউন্টারের দিকে। কাউন্টারের কর্মী কিছুতেই ভুল মানতে রাজি নন। আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, অনুরোধ করছি। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্তির চেয়ে নিয়মই বড় হয়ে ওঠে।

এদিকে হঠাৎ কানে এল পরিচিত এক শব্দ। ট্রেনের সিটি। গেছন ফিরে দেখি, ধোঁয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে ট্রেন নড়ে উঠছে।

আর এক মুহূর্তও ভাবিনি। চিৎকার করে বললাম, — "পার্থ ... দে ছুট!" আমরাও দৌড়। কেউ টিকিট নিয়ে ভাবছে না, কেউ নিয়ম নিয়ে ভাবছে না। তখন একটাই লক্ষ্য - ট্রেনটা যেন মিস না হয়। শেষ পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লাম।

তারপর?

তারপর শুরু হল জীবনের অন্যতম সুন্দর এক রেলযাত্রা। সেদিন প্রথমবার বুঝলাম কেন এই রেলপথকে এত মানুষ ভালোবাসে। ট্রেনটা যেন চলছিল না, পাহাড়ের সঙ্গে গল্প করছিল। একদিকে গভীর খাদ, অন্যদিকে

পাইন আর দেবদারুর সারি।

একসময় পৌছে গেলাম সেই বিখ্যাত বাতাসিয়া লুপে। নীচে গোল পাক খেতে খেতে রেললাইন ঘুরে যাচ্ছে। দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে পাহাড় উঁকি দিচ্ছে। সেই মুহূর্তে মনে হল — হ্যাঁ এই তো দার্জিলিং। যে পথটা নিজেই ধীরে ধীরে তার পরিচয় তুলে ধরছে।

আরও মজার বিষয়, আমাদের তিনটি টাটা সুমো পাশাপাশি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। কখনও ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও গাড়ি। জানালা দিয়ে হাত নেড়ে একে অন্যকে ডাকাডাকি চলছে। অরিন্দমের ক্যামেরা ভবিষ্যতের সাক্ষী রাখছে।

কারও কারও উৎসাহ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে কিছুটা দৌড়ে আবার উঠে পড়ল। আজ ভাবলে মনে হয়, তখনকার সেই দুঃসাহস এখন আর দেখাতে পারব না। গত পনেরো বছরে জীবন অনেকটাই বদলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ঘুম স্টেশনে নেমে আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। অল্প সময়ের সেই ট্রেনযাত্রাই যেন পুরো সফরের সেরা অধ্যায় হয়ে রইল। টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখেছি। খেলনার ট্রেনে চড়েছি। আর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছি সেন্ট পলস স্কুল — 'ম্যায় হুঁ না'-র সেই চেনা পৃথিবী।

ফেরার পথে গাড়ি নেমে চলল মিরিকের পাইনঘেরা রাস্তা ধরে। সেই পথের কথা খুব স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে, বারবার গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্য এবং আমাদের কারও কারও পাকস্থলীর প্রতিবাদ মেটাতে!

তারপর কোন ট্রেনে কীভাবে বাড়ি ফিরেছিলাম, আজ আর মনে নেই।

— x —

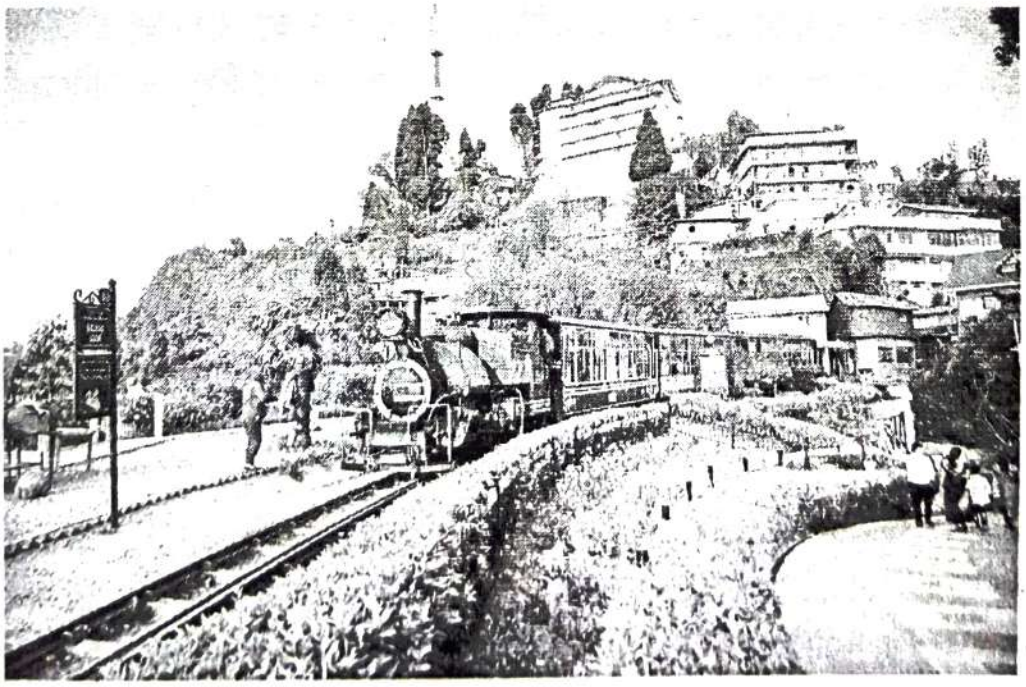

এক ছিন্নমূল যেভাবে কবিতা পড়ে

অরিত্র সান্যাল (প্রাক্তন ছাত্র)

সে এক বিপুলতা। একটা বয়সের পর পিছনে ফিরে তাকালেই মনে হয়, পড়ে আছে একটি মাঠ। বিস্তীর্ণ মাঠ। যখন পিছনে ফিরে তাকাবার মতো ক্লান্ত হইনি, এ কথা শুনেছি বড়দের মুখে, বিশ্বাস হয়নি। আজ হচ্ছে। যে ক'দিন বাঁচব, মাঠটি আয়তনে বেড়ে যাবে। দূরের বাড়িগুলির রঙ ঝাপসা ঠেকবে চোখে, দুপুরের খর-রৌদ্র চোখ ধাঁধিয়ে দিতে থাকবে। ফিরতে পারব না। কিন্তু সে তো দীর্ঘদিন থেকেই পারি না। এখন টের পাই, কিছু না কিছু আমায় ধাওয়া করেই চলে। চিরকাল ধাওয়া করেই এসেছে।

শুধু ভূমি হারালেই মানুষ ছিন্নমূল হয় না, বিশেষ করে যারা আমার মতো সময়বিচ্যুত, তারা আরও দিশেহারা। আমি কোথাও যেতে পারিনি। যেখানে সান্ত্বনা পাই, সেখানে কেবল একটি নীরব পুস্তকের মতো খুলে গিয়েছি।

যে কবিতা আমায় ধাওয়া করে শ্বাপদের মতো ঃ

আকাশে জ্যোৎস্না - বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ; / হৃদয় আমার হরিণ যেন; / রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন দিকে চলেছি! / রূপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে, / কোথাও কোনো হরিণ নেই আর; / যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ / শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন; / তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে / শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

একটি মুহূর্তের ভিতর এত এত ছবি দেখে সময় একটা বয়সের পর আমাদের কাছে আর এক থাকে না। এমনিতেই সময় কী? — জিজ্ঞাসার মধ্যে বাস করে একটি হিংস্র আদিমতা। ব্যস্ত জীবনে এক লহমার জন্য অন্যমনস্ক হলেই সম্ভাবনা থাকে এই প্রশ্ন ভেসে উঠবে, হাপুস ডুবিয়ে দেবে যা কিছু আপাতভাবে নর-অস্তিত্বের কাছে অর্থবহ। তবে ভাবি সে ডুবে যাওয়া কি এক নিমেষে হবে? মনে হয় না। বরং তা একটা রোগের মতো থেকে যাবে, তিল তিল গ্রাস করবে এক পুরুষ দু-পুরুষ তিন পুরুষ, এবং যা কিছু কেউ নিজের বলে জানে এক জীবনে।

আমার শুরুটা এভাবেই হয়েছিল। যেহেতু জীবনানন্দ দাশের কবিতা ভিতরে এক নাছোড় গুঞ্জরণের জন্ম দেয়, একটি সুগভীর বিনোদনের আড়ালে কখন তা কোন অনুভূতিকে সংক্রামিত করে আমাদের শেষ অব্দি ধরাশায়ী করে ফেলে বুঝতে পারা যায় না বেশিরভাগ সময়ই। আবার ভাবি, এ কি সমস্ত মহৎ কবিতারই গুণ নয়, যে গুণের দৌলতে একটু বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গিয়ে আমাদের 'আমি'-গুলি একটু বদলে বদলে যেতে থাকে। মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থের 'মুহূর্ত' কবিতাটি পড়ে আমার কী হয়েছিল? স্পষ্ট টের পেয়েছিলুম, মানবজীবনের একটি প্রাচীন আবেগ - ভয়, আমার মধ্যে পরিণত হয়ে উঠল সেদিন থেকে।

'আকাশে জ্যোৎস্না - বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ; / হৃদয় আমার হরিণ যেন;'। কোন তাড়া-খাওয়া হৃদয়ের মালিক ছিলেন শ্রী জীবনানন্দ দাশ তা আমার কাছে আর আগ্রহের বিষয় হয়ে থাকেনি। এ কথা সত্যি, তিনি যে সময়কালটা এই গ্রহে অতিবাহিত করেছেন, তাতে তিনি ক্ষণমাত্রও শান্তি পাননি, কিন্তু সময়ও তো অস্থিরই ছিল তখন। দূর্ভাগ্যবশত সেই অস্থিরতা পাকাপাকিভাবে মানব ইতিহাসে থেকে যাওয়ায় তাঁর কবিতার

প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই গিয়েছে এ যাবৎ। এই ভূমিহীন কাব্যপ্রয়াসী-সঙ্কুল শহরে কে-ই বা না চেয়েছে তাঁর কাব্য ক্ষমতার দীপ্তি নিজের কলমে, কিন্তু নিজের জীবন নামক যে নরকে তিনি পথচারী হয়ে থেকেছেন, সেই জীবন কি কেউ কামনা করেছে? হয়ত করেনি, কারণ এখন কার জীবনই বা নরক নয়?

বলিল অশ্বত্থ ধীরেঃ 'কোন দিকে যাবে বলো ...
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এতদিন পাশাপাশি ছিলে, তাহা ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো — আজও তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে কোন পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের!
বোচকা বেঁধেছো ঢের, — ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও? (বলিল অশ্বত্থ সেই)

মধ্য কলিকাতার যে বোর্ডিং হাউসে কবি অস্থায়ীভাবে থাকতেন, তা হ্যারিসন রোডের ধারে আজও জীর্ণ-শরীরে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে শিয়ালদহ রেলস্টেশন। বৈঠকখানা, আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে কলেজ পাড়া অব্দি বিস্তীর্ণ এলাকা একটা কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স। বইয়ের, কাপড়ের, কাগজের, ক্রীড়াসামগ্রীর দোকানে ঠাসা বাণিজ্য কেন্দ্রে দিনের বেলা যত লোক থাকে, রাত্রে তার একাংশও না। অর্থাৎ সুদূর মফস্বল ও গ্রাম থেকে আগে যেমন জীবিকার সন্ধানে মানুষ আসত শহরে, আজও তাই আসে; তারা দিনাবসানে ফিরে যায়। 'বলিল অশ্বত্থ সেই' কবিতায় এই ফিরবার কথাটি কেবল নেই।

ডেমোগ্রাফিক শিফট কখন হয়? তা নিতান্তই জীবিকার খোঁজে যে হয় না, এখানে বর্ণিত রূপে তা স্পষ্ট। এই ম্লান খোড়ো ঘরগুলো ফেলে, মাঠ প্রান্তর ছেড়ে বোচকা বুচকি বেঁধে যতদূর সম্ভব স্থাবর বিষয় নিয়ে নিজের পৃথিবী ছাড়ে মানুষ মূলত জীবনের খোঁজে। আর এইখানেই হৃত জীবনের এক কবি — বরিশাল থেকে এখানে এসে ফ্যা-ফ্যা করে শহরের রাস্তায় ঘুরছেন; তাঁরই সমকালীন হয়ে নজরুল খ্যাতির শীর্ষ ছুঁয়ে নিয়েছেন; তিনি তবু নিজের জমিটুকুই দখল নিতে পারেননি বাংলা সাহিত্যে — কবির এই জীবন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;' / এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর' ... তবে শুধু কবিরই কেন, যে-কোনো একটি ব্যর্থ মনস্কাম মানুষের জীবন হিসেবেও তা কত প্রাসঙ্গিক। '... যাবে চ'লে কোন্ পথে? / সেই পথে আরো শান্তি — আরো বুঝি সাধ? / আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?' একভাবে দেখতে গেলে সাধ, শান্তি, সুখের খোঁজেই তো পাকেচক্রে মানুষের ইতিহাস স্থান বদলের ইতিহাস। এই ধ্রুব চঞ্চলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি আর সুখকর পরিস্থিতি থেকে উদ্‌গত হয়? বিশেষ করে বিফল মনোরথ মানুষের জীবন তখন ঝোড়ো দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায়। স্মৃতিবিজড়িত এক বিন্যাসের সমাজ ছেড়ে মানুষ যখন অন্যত্র এসে থিতু হতে চায় তখন পুরোনো মূল্য বোধ বিশ্বাসকেও তো সঙ্গে করেই আনে। কিন্তু সব কি আর আনা যায়? সেই অশ্বত্থটিকে কি নিয়ে যাওয়া যাবে, যে প্রকৃতির অংশে আজীবন বিশ্বাস ওতোপ্রতো হয়ে আছে? অশ্বত্থের 'আবার কোথায় যেতে চাও?' — প্রশ্নটিকে ভোর রাতের আকাশের একটি নক্ষত্রের মতো জ্বলতে দেখি ২০১৬ সালে রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর মানব সম্প্রদায়ের ওপরে। সিরিয়ার লক্ষাধিক মানুষর ওপরে। প্রশ্নটি জ্বলছে বঙ্গের প্রান্ত-গঞ্জ থেকে মধ্য কলিকাতার মেসে ভাগ্যান্বেষণে আসা যুবকটির মাথার

ওপরেও। গফুর মিঞা ও তার মেয়ে আমিনা, বিষয় আশয় ছেড়ে চলেছেন জীবনের খোঁজে, ফুলবেড়ে — হঠাৎ আকাশে তাকিয়ে দেখলেন অশ্বত্থের এই প্রশ্ন — এই দৃশ্যকল্প আমায় কত রাত জাগিয়ে রেখেছে এখন আর মনে নেই।

'আবার কোথায় যেতে চাও?' এই 'আবার'-টি আমায় আর ছাড়ে না।

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো, — এইতো সে দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
- আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়! -
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্খার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে, — মনে হয় যেন সেই দিন!'

আবার ফিরে এলো আগের ওই চিত্রকল্প। আকাশে জ্যোৎস্না — বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ; / হৃদয় আমার হরিণ যেন ... আসলে যাকে স্থায়ী ভাবা গিয়েছিল, তা-ও আপেক্ষিক মাত্র। গ্রাম পত্তন ও তার উজার হয়ে যাওয়া একটি স্থির উদ্ভিদের কাছে সামান্য সময়ের ব্যাপার। পঞ্চাশ বছর সেখানে আর কী এমন সময়। আর হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে দেখলে তো এই ঘটনা এক পলকে ঘটে যায়। অথচ, এক একটা জীবন, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জীবন, তার মধ্যে কেটে যায়। তার মধ্যে কত অশ্রু কত ক্লান্তি, কত সুখের আজীবন স্থিরচিত্রগুলি সাজানো। অথচ এক ক্লান্তিকরভাবে সুদীর্ঘ বিফল জীবন কাটানোর বর্ণনা হয়ত কত অনায়াসেই হয়ে যায়। 'কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ / শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন' ...

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?
সেই পথে আরো শান্তি — আরো বুঝি সাধ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্খার ঘর! ...
সেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুদা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্খার ঘর!'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

সত্যি, মানুষ কবিতা পড়েই বা কেন? কী সুখ না কী এক পতঙ্গের সর্বনাশ তাকে টেনে ধরে? 'জীবনের গভীর আস্বাদ' কথাটিতে এসে পায়ের তলার মাটি সরে যায়। অন্তিম এই স্তবকের অনুনয় সরাসরি আক্রমণ করায় ধরা পড়ে এতক্ষণ এই স্থান বদলের ইতিহাস পরিসংখ্যান ও ভৌগোলিক অবস্থানের হেরফের নিয়ে কথা বার্তা একটা পলায়ন ছিল মাত্র। যে প্রিয় ভূমি আমরা ছেড়ে আসি, তা-ও হয়ত এই মানুষেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এখন শেষ চেষ্টা আঁকড়ে থাকার। যে ক্ষিদে যে স্বপ্ন যে ব্যথার বিচ্ছেদের ধূসর কাহিনী, তার ম্লান চুলের অবতার আমাদের পিছু ছাড়বে না। ম্লান চুল মানে হয়ত মলিন বেশ। নতুন আকাঙ্খার ঘরে সেই তবে কুলদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে? শুধু সামান্য ভুলে থাকার জন্য কিছু সত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে এই ছলনাটুকুই আমার বেঁচে থাকার পাঠ, আর তা জারি আছে।

"যোগেন্দ্রনারায়ণ নাকি যোগীন্দ্রনারায়ণ" - এক বিতর্ক

সুমন কুমার মিত্র (প্রাক্তন ছাত্র)

লালগোলা এম.এন. একাডেমি কিংবা এম.এন. পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তি ফলক 'যোগেন্দ্রনারায়ণ' নামটি লিখিত থাকলেও তা শুদ্ধ নয়। প্রশান্ত পালের 'রবিজীবনী' ও সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'লালগোলা রাজের জীবনী' গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় নামটিই। ৭০ বছর আগে, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐতিহাসিক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থে লালগোলা রাজবংশের ইতিবৃত্তে মহারাজা বাহাদুরের দান, মনুষত্বে ও দেশের প্রতি আনুগত্যের কথা লিখেছেন। প্রদত্ত তথ্যে তিনিও যোগীন্দ্রনারায়ণ নামটিই ব্যবহার করছেন। এমনকি এখন থেকে ১১৫ বছর আগে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থেও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, ওই দুটি গ্রন্থ-ই যোগীন্দ্রনারায়ণের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-সহ যোগীন্দ্রনারায়ণের অনেক কীর্তি আজও বর্তমান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম ও বিবিধ বিষয়ে যোগীন্দ্রনারায়ণের অবদান সর্বজনবিদিত। এ জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিভিন্ন সময়ে 'কাইসার-ই-হিন্দ', 'সুবর্ণ পদক', 'সিআইই', 'রাদা', 'রাজা বাহাদুর', 'মহারাজা' প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দে লালগোলার রাজাকে 'খিলিৎ' দেবার সময় বহরমপুর শহরে দরবার হয়। ওই দরবারে বাংলার ছোট লাট বোর্ডলিন তাঁর ভাষণে মহারাজাকে যোগীন্দ্রনারায়ণ' নামে সম্ভাষিত করে।

ঐতিহাসিক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যোগীন্দ্রনারায়ণ বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী ও পরিণামদর্শী মহাত্মা। শৈশবে ও কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না হওয়ায় উত্তর জীবনে স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন "চর্যাপদ" আবিস্কারের পর অর্থাভাবে সেই মহামূল্য পুস্তক প্রকাশ করতে না পারলে দানবীর রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় পুস্তকটির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। পুস্তকের প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহারাজর যে নামটি উল্লেখ করেছেন তা হল, "যোগীন্দ্রনারায়ণ"!

রমাপ্রসাদ ভাস্কর তাঁর চিঠিতে মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রটি তুলে ধরেছেন।

এরপর মহারাজার নাম নিয়ে আর তর্ক চলে না। তবে সঠিক নামটি জানার জন্য অতদূর যাওয়ার দরকার পড়ে না। নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' বইটি প্রায় সব গ্রন্থাগারেই.পাওয়া যায়। লালগোলার মহারাজার সঙ্গে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সুমধুর সম্পর্কের কথা সুবিদিত। দাদাঠাকুরের স্নেহধন্য, অজস্র হাসির গানের স্রষ্ঠা, 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' বইটিতে অনেকবারই মহারাজার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রতিবারই তিনি 'যোগীন্দ্রনারায়ণ' লিখেছেন। মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র, সচেতন ও তথ্যনিষ্ঠ লেখক নলিনীকান্ত মহারাজার ভুল নাম লিখতে পারেন না।

১৯শে জৈষ্ঠ্য ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর কুলদেবতা দধীবামন দেবের

মন্দির নির্মাণ করান। সেখানে মূল গর্ভগৃহের বাইরে খোদাই করা আছে যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়।

সর্বশেষে জানাই লালগোলা রাজ পরিবারের দ্বারা নির্মিত লালগোলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির রঘুনাথ বাড়ির সংস্কার কারণ মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়। সে সময়ের স্থপিত সংস্কার ফলকে রয়েছে যোগীন্দ্রনারায়ণ নামটি।

অতএব যাবতীয় তথ্য প্রমাণ অনুসারে মহারাজার আসল নাম যোগীন্দ্রনারায়ণ। কোনও মতেই তিনি 'যোগেন্দ্রনারায়ণ' নন।

সর্বশেষ ধন্যবাদ লালগোলা এম.এন. একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে, আমি তাঁকে সমস্ত তথ্য প্রমাণ দেখিয়েছিলাম এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বিদ্যালয়ের সায়েন্স বিল্ডিংয়ের "যোগেন্দ্র ভবন" নামটি সংশোধন করে" যোগীন্দ্র ভবন" করেছেন। ...

— x —

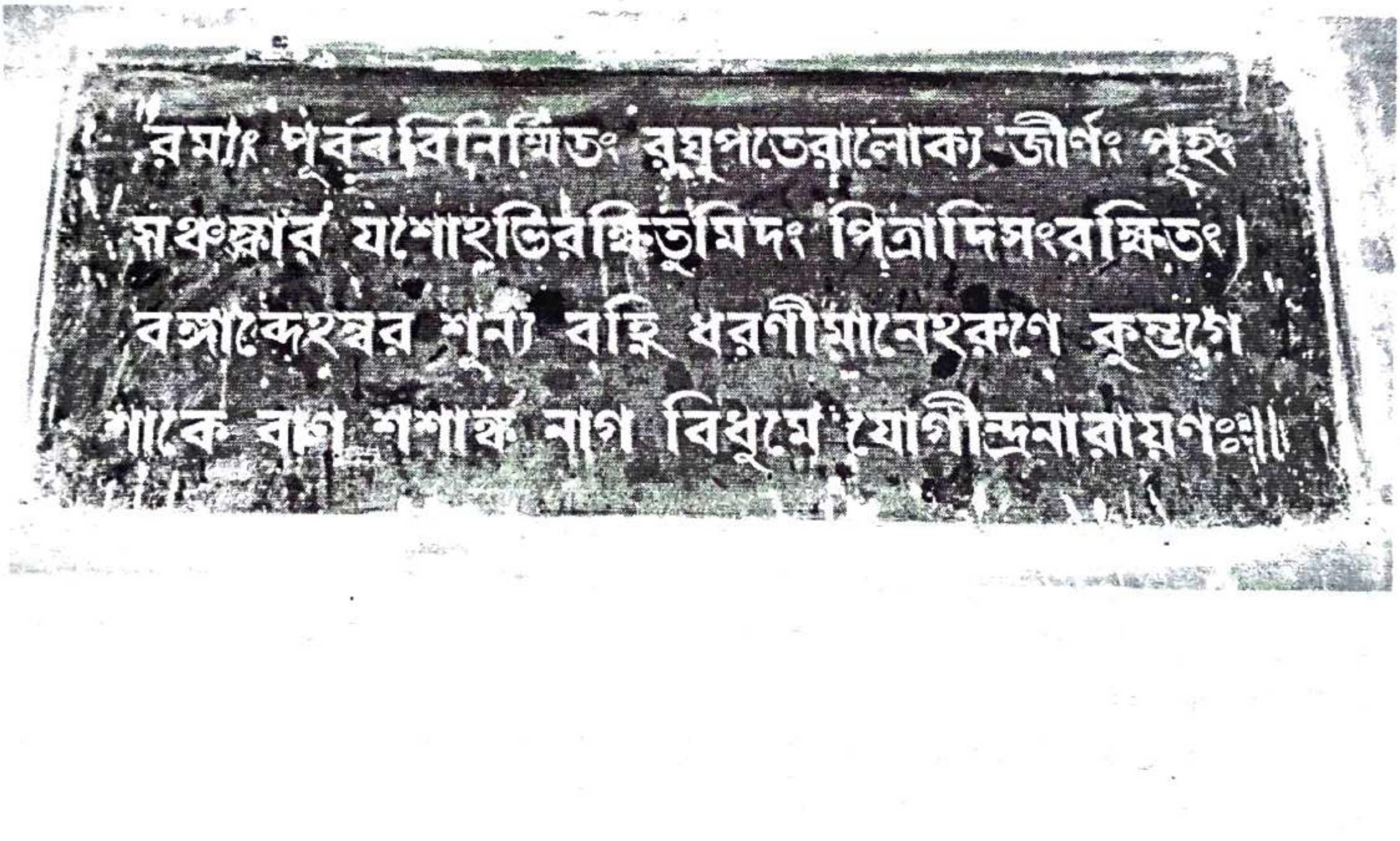

ইন্দির ঠাক্‌রুণ ঃ নিরাপত্তা হীন মানুষের জীবন কৌশল এবং মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট — এক সাহিত্যিক ও সমাজ বাস্তব বিশ্লেষণ

নাসরিন বানু শেলী (প্রাক্তন ছাত্রী)

১। ভূমিকা ঃ চরিত্র থেকে সামাজিক প্রতীকে রূপান্তর

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির এক চিরায়ত আখ্যান হিসেবে স্বীকৃত। তবে এই উপন্যাসের গভীরে নিহিত রয়েছে এক তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার দলিল। এই দলিলের অন্যতম প্রধান ভিত্তিচরিত্র হলেন ইন্দির ঠাক্‌রুণ। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে হরিহরের সংসারের এক আশ্রিত, জরাগ্রস্ত, দূরসম্পর্কের পিসি বা করুণা-প্রার্থিনী বৃদ্ধা মনে হলেও, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এক অনন্য সমাজ-বাস্তবতার প্রতীক।

ইন্দির ঠাক্‌রুণ কেবল নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের এক নিঃস্ব বিধবা নন; তিনি মূলত প্রাক-শিল্প ও ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় চরম অবহেলিত এক মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি – যারা বার্ধক্য, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে সমাজের প্রান্তিক সীমানায় নিক্ষিপ্ত হন। একদিকে তাঁর চরম নিরাপত্তাহীন জীবন, অন্যদিকে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের (এখানে হরিহর ও সর্বজয়া) মনস্তাত্ত্বিক সংকট — এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে এক গভীর জীবনসত্য উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ইন্দির ঠাক্‌রুণ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রান্তিক বৃদ্ধ মানুষের 'সারভাইভাল মেকানিজম' (Survival Mechanism) বা জীবনকৌশল, ভিখারি ও আশ্রয়হীনদের মনস্তত্ত্ব, এবং তাঁদের প্রতি মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিমুখী নৈতিকতার একটি তুলনামূলক ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা।

২। ইন্দিরা ঠাক্‌রুণের জীবনকৌশল (Survival Mechanism) ও অস্তিত্বের অর্থনীতি

সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুর্দিউ (Pierre Bourdieu) তাঁর সামাজিক পুঁজি (Social Capital) তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, মানুষের টিকে থাকার লড়াই কেবল অর্থনৈতিক পুঁজির ওপর নির্ভর করে না; বরং তার সামাজিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক অবস্থানও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইন্দির ঠাকরুণের কোনো নিজস্ব অর্থনৈতিক পুঁজি (জমি, অর্থ বা স্থায়ী রোজগার) ছিল না। ফলত, তিনি তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক বিশেষ ধরনের 'লৈঙ্গিক ও বার্ধক্যজনিত জীবনকৌশল' গড়ে তুলেছিলেন।

২.১ ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং কুক্ষিগত সম্পদ

ইন্দির ঠাকরুণের ছেঁড়া কাঁথা, ঘটি এবং একটি ছোটো পুঁটুলি — এগুলি কেবল কিছু তৈজসপত্র মাত্র নয়, এগুলি ছিল তাঁর আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার শেষ স্মারক। সর্বজয়া যখনই তাঁর এই সামান্য অধিকারের ওপর আঘাত হেনেছে, ইন্দির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাঁর ভাঁড়ারে লুকিয়ে রাখা সামান্য চাল, ডাল বা আমসি রাখা কোনো লোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি হল চরম অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নেওয়া এক অবচেতন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defensive Mechanism)। যে মানুষ জানে না যে তার রাতের আহার জুটবে কি না, তার কাছে এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়যুকুই বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

২.২ বিকল্প আশ্রয় ও সামাজিক নেটওয়ার্ক

ইন্দির ঠাক্‌রুণ হরিহরের ঘরে লাঞ্ছনা ও সর্বজয়ার কটূক্তি মুখ বুজে সহ্য করলেও, তাঁর মধ্যে একটি সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল। সেই প্রতিরোধ গড়ে উঠত তাঁর 'বিকল্প আশ্রয়' সন্ধানের কৌশলের মাধ্যমে। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের অন্য ঘরগুলো — যেমন ছিরু পালের বাড়ি বা নাপিত বউয়ের ঘর ছিল তাঁর সামাজিক নেটওয়ার্ক। সর্বজয়ার সঙ্গে কলহ হলে তিনি যে ঘটি-বাটি নিয়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠতেন, তা কেবল ক্ষণিকের অভিমান ছিল না; তা ছিল সর্বজয়াকে এই বার্তা দেওয়া যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল নন। এই 'স্পেস' বা স্থান তৈরি করার ক্ষমতা প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার এক প্রধান হাতিয়ার।

[ইন্দির ঠাকরুণের অস্তিত্ব রক্ষার বলয়]

- [ক্ষুদ্র সঞ্চয়] (লুকানো চাল, আমসি, ঘাটি)
- [বিকল্প সামাজিক নেটওয়ার্ক] (গ্রামের অন্য বাড়ির আশ্রয়)
- [অভিযান ও সাময়িক প্রস্থান] (পরনির্ভরতা হ্রাসের কৌশল)

৩। প্রান্তিক বার্ধক্য ও ভিখারি মনস্তত্ত্বের সমাজতত্ত্ব

বার্ধক্য নিজেই একটি জৈবিক ও সামাজিক সংকট, আর তা যদি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তা মানুষের মর্যাদাকে ধুলিসাৎ করে দেয়। সমাজবিজ্ঞানী সিমন দ্য বোভোয়ার (Simone de Beavoir) তাঁর *The Coming of Age* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সমাজ বুড়ো মানুষকে তখনই অপাংক্তেয় করে দেয়, যখন তার উৎপাদনশীলতা বা 'Productivity' শূন্যে নেমে আসে। ইন্দির ঠাক্‌রুণ এই উৎপাদনহীন বার্ধক্যের চরম শিকার।

৩.১ ভিখারি মনস্তত্ত্ব বনাম আত্মসম্মানের দ্বন্দ্ব

ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভিক্ষাবৃত্তি না করলেও, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি অনেককাংশেই ভিখারি মনস্তত্ত্বের (Beggar Psychology) কাছাকাছি পৌঁছাতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যের অনুগ্রহের ওপর বেঁচে থাকার কারণে তাঁকে প্রতিনিয়ত নিজের আত্মসম্মানকে সংকুচিত করতে হতো। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই চরিত্রটিকে কেবল একঘেয়ে ভিখারি হিসেবে আঁকেননি। ইন্দিরের মধ্যে এক তীব্র রাজকীয় অভিমান ছিল। তিনি যখন অপমানে ঘর ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর লাঠি ঠকঠক করে হাঁটার শব্দের মধ্যে তার সেই রাজকীয় অভিমানের সাথে এক অদ্ভুত আত্মমর্যাদা প্রকাশ পায়।

৩.২ আধুনিক সমাজ ও প্রান্তিক বৃদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক সমান্তরালতা

সমকাল ও আধুনিক সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইন্দির ঠাক্‌রুণের এই মনস্তত্ত্ব আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠছে, তখন বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজেদের বাড়িতেই 'আশ্রিত' বা 'অনাকাঙ্খিত' বোধ করেন। তাঁদের জমানো সামান্য পেনশনের টাকা বা গোপন সঞ্চয় মূলত সন্তানদের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতীক নয়; বরং তা ইন্দির ঠাকরুণের মতোই এক মানসিক ঢাল, যা তাঁদের এই ভেবে সান্ত্বনা দেয় যে — "সবাই ছেড়ে গেলেও এইটুকু আমার পাশে থাকবে।"

৪। মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকট ও সর্বজয়ায় চরিত্রগত দ্বিমুখিতা

পথের পাঁচালী উপন্যাসে সর্বজয়ার চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক বুনন। সর্বজয়া নিষ্ঠুর বা খলনায়িকা নয়; সে নিজেই এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের শিকার। কিন্তু তার এই অর্থনৈতিক সংকট তার নৈতিকতাকে এক ধরনের সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৪.১ সীমিত সম্পদের দ্বন্দ্ব (Resource Scarcity)

সর্বজয়ার নিজের সন্তানদের (অপু ও দুর্গা) মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ ছি না। এই সীমিত সম্পদের সংসারে ইন্দির ঠাক্‌রুণের মতো একজন উৎপাদনহীন, বয়স্ক মানুষের ভাগ বসানোকে সর্বজয়া এক ধরনের 'বাড়তি বোঝা' বা 'অর্থনৈতিক পরজীবী' হিসেবে গণ্য করেছে। মধ্যবিত্তের এই সংকট অত্যন্ত বাস্তব। যখন নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো মধ্যবিত্তের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সর্বজয়ার ভাষায় — "নিজের ছেলেমেয়ের মুখে ভাত জোটে না, উনি এলেন পিসিমার ভাগ বসাতে!"

৪.২ সামাজিক মর্যাদা ও অহংকার (Status Anxiety)

হরিহর রায় বংশমর্যাদায় উচ্চ হলেও অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব। সর্বজয়া এই আভিজাত্যের অবশিষ্টাংশটুকু ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার কাছে ইন্দির ঠাকরুণের ভাঙা কাঁথা পায়ে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো বা অন্যের কাছে গিয়ে ঘরের অভাবের কথা বলাটা তাদের 'পারিবারিক সম্মানে' আঘাত হানে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা সবসময় তার দারিদ্রকে আড়াল করতে চায়, কিন্তু ইন্দির ঠাকরুণের নগ্ন দারিদ্র সেই আড়ালকে ভেঙে দেয়। এখানেই ইন্দিরের প্রতি সর্বজয়ার তীব্র আক্রোশের অন্যতম কারণ।

৫. প্রান্তিক বাস্তবতা বনাম মধবিত্ত নৈতিকতা ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইন্দির ঠাক্‌রুণ এবং সর্বজয়ার দ্বন্দ্ব আসলে দুটি ভিন্ন জীবনদর্শনের ও শ্রেণির সংঘাত। মধ্যবিত্ত সমাজ নৈতিকতাকে একটি আপেক্ষিক, বিমূর্ত এবং আদর্শিক স্থান থেকে দেখে। কিন্তু প্রান্তিক মানুষের কাছে নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় ক্ষুধার তীব্রতা এবং বেঁচে থাকার তাগিদ দ্বারা। নীচের সারণির মাধ্যমে এই দুই মানসিকতার তুলনামূলক রূপরেখা বিশ্লেষণ করা হল ঃ

তুলনামূলক দিক	প্রান্তিক বাস্তবতা (ইন্দির ঠাক্‌রুণ)	মধ্যবিত্ত মানসিকতা (সর্বজয়া)
নিরাপত্তার উৎস	অভিযোজন ক্ষমতা, সামাজিক সম্পর্ক ও তাৎক্ষণিক সঞ্চয়।	স্থায়ী কাঠামো, পারিবারিক মর্যাদা, সামাজিক সম্মান ও আভিজাত্য।
নৈতিকতার ভিত্তি	পরিস্থিতিনির্ভর এবং অস্তিত্ব রক্ষামূলক (Survival-based)।	নিয়মবদ্ধ, লোকলজ্জা-ভয় এবং সামাজিক আচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
সংকটের প্রতিক্রিয়া	অনিশ্চয়তাকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মেনে নিয়ে মানিয়ে নেওয়া।	কাঠামো ভেঙে পড়লে তীব্র মানসিক বিপর্যয় এবং আগ্রাসী রূপ ধারণ।
সম্পর্কের মূল্যায়ন	যেখানে স্নেহ ও সামান্য খাদ্যের নিশ্চয়তা মেলে, সেখানেই যুক্ত হওয়া।	উপযোগিতা, অর্থনৈতিক বোঝা এবং সামাজিক মর্যাদার নিক্তিতে বিচার।

৬। বিভূতিভূষণের মানবতাবাদী দৃষ্টি এবং 'সামাজিক দলিল' হিসেবে ইন্দির ঠাক্‌রুণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক ও প্রকৃতিবাদী লেখক হিসেবে খ্যাত হলেও, ইন্দির ঠাকরুণের চিত্রায়ণে তিনি যে নির্মম বাস্তববাবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যকেও হার মানায়। তিনি ইন্দিরকে কোনো দেবত্বে ভূষিত করেননি, আবার তাকে পুরোপুরি ডাইনি বা স্বার্থপরও বানাননি।

৬.১ অপুর চোখে পিসি ঃ এক বিকল্প রূপকথা

উপন্যাসে অপুর চরিত্রটির বিকাশে ইন্দির ঠাক্‌রুণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সর্বজয়া যখন ইন্দিরকে অবহেলা করেছে, শিশু অপু ও দুর্গা তখন তাঁর কাছে খুঁজে পেয়েছে এক রূপকথার জগৎ। ইন্দিরের ঝুলিতে থাকা ছড়া, গল্প আর সামান্য নারকেলের নাড়ু অপুর কল্পনাশক্তিকে উস্কে দিয়েছে। বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন যে, সমাজের যে মানুষটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত অর্থনীতিতে 'অনুপযোগী', সেই আবার মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশাল অমূল্য সম্পদের আধার হতে পারে।

৬.২ ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু ঃ গ্রামীণ ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রূপ

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু দৃশ্যটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ও বেদনাদায়ক দৃশ্য। ঘরের দাওয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে, বনের ধারে, গ্রামের এক পরিত্যক্ত ঘাটে তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকে। ঘটি আর পুঁটলিটি পাশে পড়ে থাকে - যা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকার সংগ্রামের নীরব সাক্ষী। এই মৃত্যু কেবল একটি বৃদ্ধার শারীরিক অবসান নয়, এটি আসলে গ্রামীণ সমাজের যৌথ দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার প্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যুর প্রতীক।

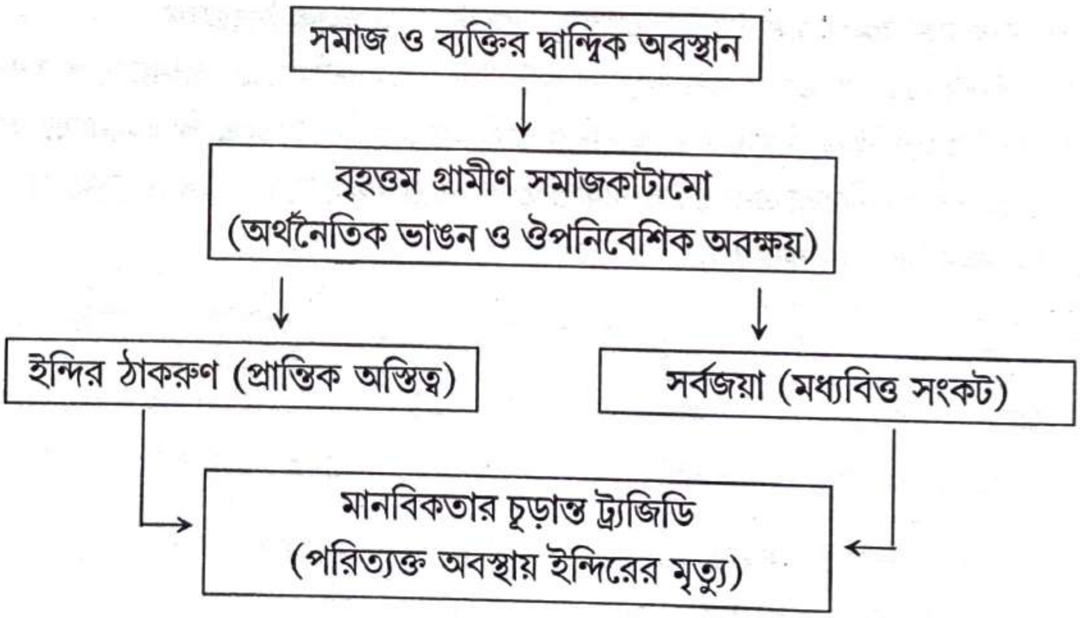

৭। সমকালীন ও বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে ইন্দির ঠাকরুণের প্রাসঙ্গিকতা

আজকের পুঁজিবাদী ও উত্তর-আধুনিক সমাজে ইন্দির ঠাক্‌রুণ চরিত্রটির প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায়নি, বরং আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে 'Ageism' বা বার্ধক্যজনিত বৈষম্য একটি বড়ো সামাজিক ব্যাধি।

- **বৃদ্ধাশ্রমের মনস্তত্ত্ব ঃ** আধুনিক শহরের বিলাসবহুল বা সাধারণ বৃদ্ধাশ্রমের দিকে তাকালে ইন্দির ঠাকরুণেরই আধুনিক সংস্করণ দেখা যায়। সেখানেও বৃদ্ধ মানুষরা তাঁদের স্মৃতি, ছেঁড়া ছবি বা ছোটোখানো জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা করেন, যা ইন্দিরের পুঁটুলির সমার্থক।

- **সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (Social Safety Net) ঃ** কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলোতে বৃদ্ধ ও প্রান্তিক মানুষের জন্য ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আজও লক্ষ লক্ষ 'ইন্দির ঠাক্‌রুণ' কোনো রাষ্ট্রীয় বা পারিবারিক নিরাপত্তা ছাড়াই প্রতিদিন ফুটপাতে, স্টেশনে বা রাস্তার মোড়ে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

৮। উপসংহার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*-র ইন্দির ঠাক্‌রুণ চরিত্রটি কেবল উনিশ শতকের শেষভাগের বাংলার এক গ্রামীণ বৃদ্ধার উপাখ্যান নয়; এটি কাল-কে অতিক্রম করে এক সর্বজনীন মানবিক দলিলে পরিণত হয়েছে। লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে দারিদ্র মানুষের স্বভাবজাত কোমলতাকে গ্রাস করে এবং তাকে এক প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর গড়ে তুলতে বাধ্য করে।

ইন্দির ঠাকরুণের তথাকথিত 'স্বার্থপরতা' আসলে তাঁর বেঁচে থাকার তীব্র আকুলতা। অন্যদিকে সর্বজয়ার নিষ্ঠুরতা কোনো ব্যক্তিগত খলত্ব নয়, তা হল ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণির টিকে থাকার মরণপণ লড়াইয়ের এক অনিবার্য ও অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া। এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের এই সত্যেরই মুখোমুখি দাঁড় করায় যে – যতক্ষণ না সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিটি প্রান্তিক, বয়স্ক এবং অসহায় মানুষের মৌলিক ও মানসিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারছে, ততক্ষণ সমাজ থেকে এই অস্তিত্বের সংঘাত দূর হবে না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাই চিরকাল সাহিত্যের পাতা ছাড়িয়ে আমাদের সামাজিক বিবেকের কাছে এক জ্বলন্ত প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়েই বেঁচে থাকবেন।

–x–

আপসহীন শিল্পী অরিজিৎ সিং

সম্বল কুমার ঘোষ (সহকারী শিক্ষক)

চলচ্চিত্রের গান কি কেবলই বিনোদন, নাকি তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে গভীর জীবন দর্শন আর কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস? বর্তমান প্রজন্মের কণ্ঠ শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের শৈশব থেকে আজ ভারতের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়ে ওঠা এবং তাঁর আপসহীন জীবনের নেপথ্য কথা —

মুম্বাইয়ের গ্ল্যামার জগত, কোটি কোটি টাকার হাতছানি আর তারকাসুলভ জাঁকজমক — এই সব কিছুর মাঝেও যদি কোনো মানুষ নিজের মাটির শিকড় ও আত্মমর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। বর্তমান ভারতীয় সংগীত জগতে তিনি কেবল একটি নাম নন, তিনি এক অনন্য আদর্শের প্রতীক। কিন্তু একদিনে বা কোনো জাদুকাঠির ছোঁয়ায় তিনি আজকের এই অবস্থানে পৌছননি। এর পেছনে রয়েছে এক বীজের মহীরূহ হয়ে ওঠার দীর্ঘ ও কন্টকাকীর্ণ যাত্রাপথ।

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্চের এক অতি সাধারন পরিবারে অরিজিতের জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই তার বাড়িতে ছিল সংগীতের এক পবিত্র পরিবেশ। মা ও দিদিমার কাছ থেকে গানের প্রাথমিক দীক্ষা পাওয়ার পর তিনি গুরু রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রথাগত শিক্ষা শুরু করেন। জিয়াগঞ্জের ধুলো মাটি মেখে বড় হওয়া সেই সাধারণ ছেলেটির মনের ভিতরে তাঁর মা দিদিমা সুরের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত গভীর ও খাঁটি।

২০০৫ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে অরিজিৎ মুম্বাইয়ের এক নামি রিয়্যালিটি শো তে অংশ নেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চূড়ান্ত পর্বের আগেই তিনি সেখান থেকে পক্ষপাতীত্বের কারণে অন্যায্য ভাবে ছিটকে যান। আজ যাঁরা তাঁকে সাফল্যের শিখরে দেখছেন তাঁরা হয়তো জানেন না যে এরপর দীর্ঘ প্রায় আট বছর তাঁকে কতটা অবহেলা ও উপেক্ষার গ্লানি সহ্য করতে হয়েছিল। বলিউডের বড় বড় প্রযোজক পরিচালকেরা প্রথম দিকে তাঁর প্রতিভাকে পাত্তাই দেননি কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। পর্দার আড়ালে মিউজিক প্রোগ্রামার হিসেবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে খাটতে প্রতিনিয়ত তীব্র প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হয়েছেন, অথচ নিজের সুর সাধনা থেকে এক চুলও নড়েননি।

দীর্ঘ আট বছরের সেই নীরব একাকীত্বও নিজেকে প্রমাণ করার তীব্র আকুলতা আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল ২০১৩ সালে। **আশিকি-২ সিনেমায় তাঁর কণ্ঠে মুক্তি পেল 'তুম হি হো'**। সুরকার ও গীতিকার মিথুনের সেই সহজ সরল শব্দগুলোতে অরিজিৎ যেন তাঁর যাপিত জীবনের সমস্ত কষ্ট ও আর্তি ঢেলে দিলেন। এই গানের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার মূল কারণটি লুকিয়ে আছে অরিজিতের তৎকালীন বয়সের এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক রসায়নে। শাররিক ও টেকনিক্যাল দিক থেকে বিচার করলে এই বয়সে একজন গায়কের কণ্ঠের 'ভোকাল কর্ড' তার পূর্ণ যৌবনে থাকে। অরিজিতের কণ্ঠে তখন ছিল এক অদ্ভুত কোমলতা অথচ চড়া পর্দায় গাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দম ও শক্তির কোনো অভাব ছিল না। তিনি যখন গেয়ে ওঠেন তখন তাঁর গলার সেই সূক্ষ্ম ভাঙন বা 'গ্রেট' শুনে শ্রোতাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই মিষ্টি টেক্সচারটি কোনো কম্পিউটারের সফট্ওয়্যার বা 'অটো-টিউন' দিয়ে তৈরি করা অসম্ভব। এটি ছিল এক খাঁটি অপাপবিদ্ধ যুবকের

গলার আওয়াজ যার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না।

মিথুনের লেখা শব্দগুলো অত্যন্ত সহজ সরল কিন্তু তীব্রভাবে আন্তরিক। অরিজিতের ২৬ বছরের কণ্ঠের গভীরতায় এই গানটির প্রতিটি লাইনের অর্থ কীভাবে কালজয়ী হয়ে উঠেছে, তা লক্ষ্য করার মতো ঃ

"হাম তেরে বিন অব রেহ নেহি সকতে / তেরে বিনা ক্যায়া ওজুদ মেরা"

গানটির এই সূচনা লাইনেই অরিজিতের কণ্ঠ আমাদেরকে এক চরম অসহায়ত্বের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কেরিয়ারের শুরুতে পাত্তা না পাওয়া ছাব্বিশ বছরের যুবকের কণ্ঠে এই "**রেহ নেহি সকতে**" (বাঁচতে পারি না) শব্দবন্ধটি কোনো কৃত্রিম বা হালকা সংলাপ মনে হয় না। তাঁর গলার টেক্সচারে এমন এক তীব্র হাহাকার ফুটে ওঠে যা শ্রোতাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এই নিবিড় আত্মিক বন্ধন কেবল মুখের কথা নয় এই অস্তিত্বের লড়াই।

"তুঝসে জুদা গর হো জায়েঙ্গে / তো খুদসে হি হো জায়েঙ্গে জুদা"

এখানে এসে সুরটি একটু চড়তে শুরু করে এবং অরিজিতের কণ্ঠের ভোকাল পাওয়ার বা দমের গভীরতা টের পাওয়া যায়। নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির থেকে আলাদা হওয়ার মানে যে নিজের আত্মা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া – এই গভীর দর্শনটি অরিজিৎ তার কণ্ঠের এক অদ্ভুত কাঁপুনি বা 'ভাইব্রেটো' (মৃদু কম্পন) দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কিঁউঁকি তুম হি হো, অব তুম হি হো / জিন্দেগি অব তুম হি হো / চেইন ভি. মেরা দর্দ ভি /
মেরি আশিকি অব তুম হি হো"

স্থায়ীর এই মূল অংশে এসে গানটি তার চরম আবেগে পৌঁছায়। "**কিঁউঁকি তুম হি হো**" বলার সময় অরিজিতের কণ্ঠে থাকে এক পরম আত্মসমর্পণ। বিশেষ করে "**চেইন ভি, মেরা দর্দ ভি**" (আমার শান্তি ও তুমি আমার কষ্টও তুমি) লাইনটিতে সুরের যে সূক্ষ্ম ওঠা-নামা সেখানে ২৬ বছরের অরিজিৎ আনন্দের চেয়ে বিরহ ও যন্ত্রণার আর্তিটাকে বেশি স্পষ্ট করে তুলেছেন। যেটা এই বয়সের কণ্ঠের পরিপক্কতা ছাড়া প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল।

"তেরা মেরা রিশতা হ্যায় ক্যায়সা
এক পল দূর গাওয়ারা নহি
তেরে লিয়ে হর রোজ হ্যায় জিতে
তুমকো দিয়া মেরা ওয়াক্ত সব
কোঈ লামহা মেরা না হো তেরে বিনা
হর সাশ পে নাম তেরা
কিঁউকি তুম হি হো"

অরিজিৎ এই অংশে তাঁর সিগনেচার 'চেস্ট ভয়েস' এবং 'মিক্সড ভয়েস'-এর এক অপূর্ব অনুপাত ব্যবহার করেছেন '**তেরা মেরা রিশতা**' — লাইনটা শুরু হয় এক ধরনের মৃদু ফিসফিসানি বা ব্রেদি টেক্সচার দিয়ে কিন্তু যখনই তিনি '**এক পল দূর**'-এ পৌছান তাঁর কণ্ঠের প্রাবল্য এক ধাক্কায় বেড়ে যায়, যা দূরত্বের তীব্র যন্ত্রনাকে ফুটিয়ে তোলে। "**হর সাশ পে ...**" লাইনে এসে তিনি স্বরকে সোজা না রেখে মৃদু কাঁপিয়ে দেন - এটি হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশের এক অতি উচ্চমানের অর্গানিক কৌশল।

অন্তরাটি শেষ হয়ে যখন আবার মূল স্থায়ী অংশ "**কিঁউকি তুম হি হো**" তে ফিরে আসে তখন শ্রোতার মনে ক্যাথারসিস বা আবেগের চরম মুক্তি ঘটে। অন্তরা জুড়ে যে অস্থিরতা দূরত্ব এবং আকুতির কথা বলা

হচ্ছিল, "**কিউ কি তুম হি হো**" লাইনে এসে তা এক পরম সত্যে স্থির হয়ে চরম পরিণতি পায়। অরিজিৎ এখানে তাঁর কণ্ঠের সম্পূর্ণ উন্মোচন ঘটিয়ে শ্রোতাকে এক ধরনের অলৌকিক সাউন্ড স্কেপে নিয়ে যান। সেখানে প্রেম আর ঈশ্বর এক হয়ে যায়।

'**তুম হি হো**'র পর আর অরিজিৎকে পিছনে ফিরে তাকতে হয়নি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিজেকে ভারতের এক নম্বর এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। '**লাল ইসক**', '**আয়াত**', '**চন্না মেরেয়া**'/ বা '**নাদান পরিন্দে**'র মতো কঠিন ও ভারী গানগুলিতে তাঁর কণ্ঠেহন্দর বৈচিত্র্য ও গায়কীর নিখুঁত কাজ তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। হিন্দি বাংলা সহ দেশের একাধিক ভাষায় তার গান কোটি কোটি মানুষের রোজকার জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে অরিজিৎ সিং আর পাঁচটা সাধারন তারকার মতো নন। জনপ্রিয়তার একেবারে মধ্য গগনে থাকা অবস্থায় তিনি এক যুগান্তকারী ও সাহসী ঘোষণা করেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি আর বলিউড সিনেমার প্লে ব্যাক সিঙ্গার হতে চান না। সিনেমার একঘেয়ে বাণিজ্যিক ফর্মুলা, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কর্পোরেট সিন্ডিকেট এবং নিজের স্বাধীন সুর সৃষ্টির তৃষ্ণার কারণে তিনি এই একচেটিয়া বাজারকে অবলীলায় বিদায় জানান। অর্থ ও সস্তা খ্যাতির মোহে নিজের শিল্পী সত্তাকে বিক্রি না করার এই যে জেদ এটাই তাকে এক '**আপসহীন শিল্পী**' হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে।

অরিজিৎ সিংয়ের এই আপসহীন সঙ্গীতযাত্রা এবং তাঁর গায়কীর সততা আজ কেবল সাধারন শ্রোতাদেরই নয়, বরং বিশ্বসংগীতের তাবড় তাবড় কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদেরও শ্রদ্ধাবনত করেছে।

ভারতীয় সংগীতের গোল্ডেন এরা বা নব্বইয়ের দশকের মেলোডি কিং কুমার শানু, সোনু নিগম, উদিত নারায়ণ এবং সুরের সাম্রাজ্ঞী অলকা ইয়াগনিকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে — মোহাম্মদ রফি বা কিশোর কুমার যুগের পর অরিজিৎ সিংই হলেন সেই বিরল গায়ক, যাঁর কণ্ঠে মেলোডি ও আবেগ কোনো কম্পিউটারের বা 'অটো টিউনের' কৃত্রিম সাহায্য ছাড়াই শ্রোতার চোখে জল এনে দিতে পারে। কুমার শানু যেমন এক 'কোটি কোটির মধ্যে একটা প্রতিভা' বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন, তেমনি সোনু নিগম মুগ্ধ হয়েছেন অরিজিতের ভেতরের সুরের পবিত্রতা ও অহংকারহীন ব্যক্তিত্ব দেখে।

ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রখ্যাত গায়িকা কবিতা কৃষ্ণমূর্তি এবং বিশ্ব বিখ্যাত সিম্ফনি কান্ডাক্টর জুবিন মেহেতা অরিজিতের সুরের পরিমিতিবোধ ও রাগ ভিত্তিক গানকে মূলধারায় জনপ্রিয় করার প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত অভিনেতারা অরিজিতের গাওয়া গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন এবং মুগ্ধ হয়ে বলেছেন তাঁর কণ্ঠের মাটির টান যে-কোনো অভিনয়কে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে অস্কার বিজয়ী এ.আর. রহমান প্রত্যেকেই এক বাক্যে অরিজিৎকে বিশ্ব সংগীতেরএক বিস্ময়কর প্রতিভা (phenomenon) বলে আখ্যা দিয়েছেন — যিনি তারকা হয়েও সব সময় সুরের একজন বিনম্র ছাত্র হিসেবে নিজেকে গণ্য করেন।

কোটি কোটি টাকা উপার্জন এবং দেশ জোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও অরিজিৎ মুম্বাইয়ের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে ফিরে এসেছেন তার নিজের জন্মভিটে জিয়াগঞ্জে। আমির খানের মতো তারকা — যাঁর সিনেমা দেখে অরিজিৎ সিং বড় হয়েছেন তিনিও জিয়াগঞ্জে দেখা করতে আসেন তাঁর সঙ্গে। আজও তিনি সেখানে একজন অতি সাধারণ মানুষের মতো স্কুটারে চড়ে ঘুরে বেড়ান, সাধারণ পোশাক পরেন। নিজের উপার্জনের একটা

বিরাট অংশ তিনি নীরবে ব্যয় করেন নিজের গ্রামে স্কুল তৈরি, আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র চালানো এবং দুঃস্থ শিশুদের সব ধরনের সাহায্য করার জন্য। গ্ল্যামার জগতের অহংকারকে পায়ে ঠেলে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযোজিত করার এই মানসিকতা বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

চলচ্চিত্রের প্লে-ব্যাক ছেড়ে দিলেও অরিজিৎ তার লাইভ কনসার্ট এবং স্বাধীন শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। স্টেজে যখন তিনি গিটার হাতে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে গান ধরেন সেখানে কোনো কম্পিউটারের কারসাজি থাকে না, থাকে সুরের এক খাঁটি ও বিশুদ্ধ সততা। লাইভ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি আজও শ্রোতাদের সাথে সেই নিবিড় আত্মিক বন্ধনটি টিকিয়ে রেখেছেন।

সবচেয়ে গর্বের বিষয় হল বিশ্ব সংগীতের দরবারে ঝড় তোলা এই অসাধারণ শক্ত মেরুদন্ডের মানুষটি আমাদের নিজেদের এলাকার ছেলে, ঘরের ছেলে। কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করেও যিনি নিজের শেকড়কে ভোলেননি। তাঁর সংগ্রাম আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লড়াই করার প্রেরণা যোগায়। আমাদের ঘরের এই কৃতি সন্তানের জন্য রইল অন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনার বিনয় ও সুরসাধনা নিয়ে আপনি সুরের আকাশে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকুন।

- o -

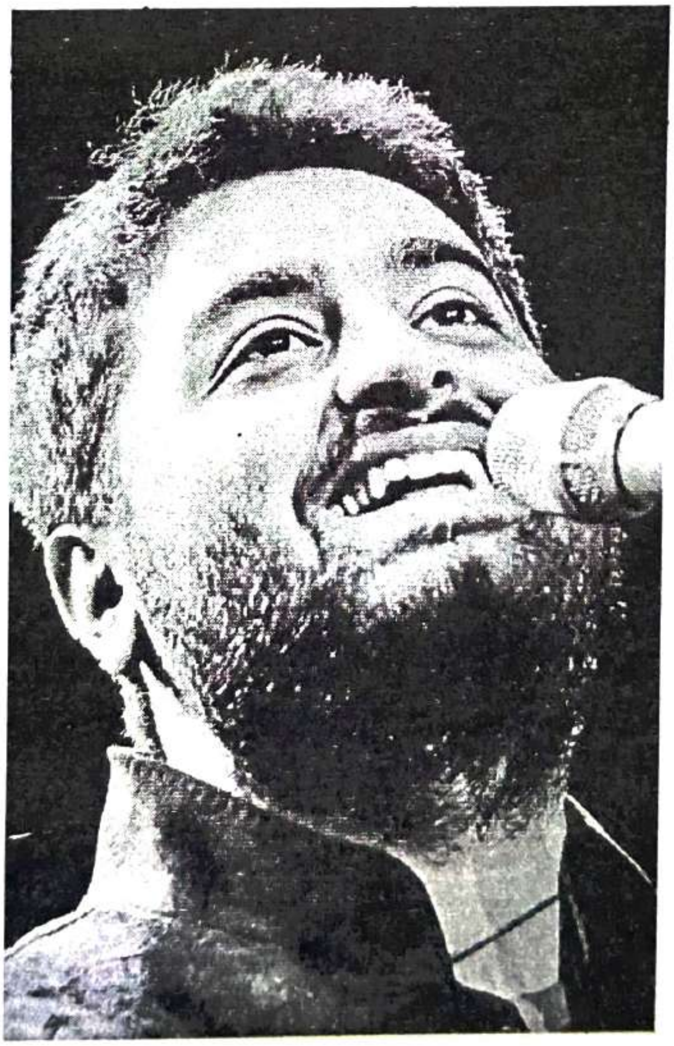

লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমি

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

বিভিন্ন পুরস্কারের নামের তালিকা

ক্র.নং.	পুরস্কারের নাম	শ্রেণি	বিষয়	দাতা
১	সত্যনারায়ণ স্মৃতি পদক	নবম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম	লালগোলা নিবাসী শ্রী রামগোবিন্দ ওঝা মহাশয় তাহার স্বর্গতঃ পুত্র সত্যনারায়ণ ওঝার স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
২	সীমা সান্যাল স্মৃতি পুরস্কার	উচ্চ মাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে প্রথম	শ্রীমতী শান্তি সান্যাল অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সীমা সান্যালের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
৩	বিষ্ণুচরণ দাস স্মৃতি পুরস্কার	পঞ্চম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম	জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় মদন মোহন রায় মহাশয় বিদ্যালয়ের ৫ জন প্রাক্তন কর্মীর স্মৃতিতে এই ৫টি পুরস্কার চালু করেন।
৪	বৈদ্যনাথ সরকার স্মৃতি পুরস্কার	ষষ্ঠ শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম	
৫	কালিপদ পাল স্মৃতি পুরস্কার	সপ্ত শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় ভূগোলে প্রথম	
৬	দিবাকর ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	অষ্টম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম	
৭	উপেন্দ্রনাথ অধিকারী স্মৃতি পুরস্কার	নবম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম	
৮	বলদেব ভকত ও রামেশ্বরী ভকত স্মৃতি পুরস্কার	পঞ্চম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম	জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মাননীয় কিষাণ চাঁদ ভকত মহাশয় এই পুরস্কার চালু করেন।
		ষষ্ঠ শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম	
		সপ্তম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম	
		অষ্টম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম	
		নবম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম	
৯	অলক সান্যাল স্মৃতি পুরস্কার	মাধ্যমিক	বাংলায় প্রথম	২০০০ সালে অত্র বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ প্রাক্তন স্বর্গীয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অলক কুমার সান্যাল মহাশয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১০	মাধবেন্দ্র নারায়ণ রায় স্মৃতি বৃত্তি	অষ্টম শ্রেণি নবম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম (75%+) বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে প্রথম (75%+)	জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মদন মোহন রায় তাঁর অগ্রজ স্বর্গীয় মাধবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।

ক্র.নং.	পুরস্কারের নাম	শ্রেণি	বিষয়	দাতা
১১	রমজান আলি স্মৃতি পুরস্কার	উচ্চ মাধ্যমিক	ইংরেজিতে বিদ্যালয়ে প্রথম (55%+)	অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মরহুম মহম্মদ হাবিবুল্লাহ মহাশয় তাঁর দাদু মরহুম রমজান আলির স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১২	রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি বৃত্তি	অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে একজন ছাত্র	দুঃস্থ ও মেধাবী (60%+) নম্বর পেতে হবে।	পাহাড়পুর গ্রামের আদি বাসিন্দা ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ শ্যামাচরণ দত্ত, শ্রী উমাচরণ দত্ত এবং শ্রী বামাচরণ দত্ত মহাশয়গণ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৩	মেঘা জৈন স্মৃতি বৃত্তি	নবম শ্রেণি	বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর মধ্যে দুঃস্থ ও মেধাবী	মৈনাদেবী মেঘা জৈন এর স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৪	সতীনাথ সাহা মেমোরিয়াল স্কলারশিপ	মাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ	বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রশান্ত কুমার সাহা মহাশয় শ্রী সতীনাথ সাহা মহাশয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৫	গোপাল চন্দ্র দাস স্মৃতি বৃত্তি	পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে যে-কোনো দুই জন ছাত্র/ছাত্রী	আদর্শ ছাত্র/ছাত্রী	লালগোলা টাউন লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাকারিক শ্রী বিমল কুমার দাস মহাশয় তাঁর স্বর্গীয় পিতা, শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৬	হরিনাথ রায় স্মৃতি বৃত্তি	উচ্চমাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যায় সর্বোচ্চ	বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রী হরিনাম রায় মহাশয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৭	সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ব্রজেশ্বরী বিশ্বাস, নিশিকান্ত বিশ্বাস ও প্রমীলা বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে গণিতে সর্বোচ্চ	বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সুজন কুমার বিশ্বাস ও বিজন কুমার বিশ্বাস এবং ছাত্রী মল্লিকা বিশ্বাস ও যুথিকা বিশ্বাস এই পুরস্কার চালু করেন।
১৮	মানস কুমার রায় স্মৃতি পুরস্কার	মাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে জীবন বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ	শ্রীমতী গোপা রায় মহাশয়া তাঁর স্বর্গীয় স্বামী ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মানস কুমার রায়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।
১৯	বরদাচরণ মজুমদার স্মৃতি বৃত্তি	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ	বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মদন মোহন ঘোষ ও পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করেন।

ক্র.নং.	পুরস্কারের নাম	শ্রেণি	বিষয়	দাতা
২০	অভয়াসুন্দরীদেবী স্মৃতি বৃত্তি	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ	অভয়াসুন্দরী দেবী মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
২১	মহেশ নারায়ণ রায় স্মৃতি বৃত্তি	মাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে প্রথম ও দ্বিতীয়	অভয়াসুন্দরী দেবী মেমোরিয়াল ফান্ড তেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
২২	প্রধান শিক্ষক পদক	যে-কোনো শ্রেণি	আদর্শ ছাত্র/ছাত্রী	বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক এই পুরস্কার প্রদান করেন।
২৩	বার্ষিক কৃতি পুরস্কার	পঞ্চম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণি	প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়	লালগোলা এন.এন. একাডেমি
২৪	বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় স্মৃতি বৃত্তি	নবম ও একাদশ শ্রেণি	একজন করে কৃতি ছাত্র/ছাত্রী পাবে, প্রতি মাসে দু' হাজার টাকা করে এক বছর দেওয়া হবে।	রূপেন্দ্র নারায়ণ রায় এই পুরস্কার চালু করেন।
২৫	নাথু মণ্ডল স্মৃতি বৃত্তি	মাধ্যমিক	বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ	মাইনুদ্দিন সেখ এই পুরস্কার চালু করেন।

কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত

লালগোলা মহেশ নারায়ণ একাডেমির পক্ষে
অরুণ কুমার দাস, প্রধান শিক্ষক দ্বারা প্রকাশিত।

1914lmna@gmail.com
www.lalgolamnacademy.in